সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের
গণআন্দোলন
প্রসঙ্গে

এস ইউ সি আই

প্রকাশকের কথা

দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির মুনাফার স্বার্থে কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য পুঁজিপতিশ্রেণীর দলগুলোর মতোই পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার জোর করে কৃষক-বর্গাদার-খেতমজুর উচ্ছেদ করে কৃষিজমি দখলের যে অভিযান সিঙ্গুর দিয়ে শুরু করেছিল এবং প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল, নন্দীগ্রাম সেই প্রতিরোধকে এক ইতিহাসসৃষ্টিকারী গণআন্দোলনের স্তরে উন্নীত করেছে।

গোড়া থেকেই সরকারি এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করা থেকে শুরু করে তাকে প্রতিরোধ করার মতো উপযুক্ত সংগঠন একেবারে গ্রাম স্তর থেকে গড়ে তুলতে এস ইউ সি আই সচেষ্ট থেকেছে এবং লড়াইয়ের অংশীদার হয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সংগ্রাম করেছে। 'শিল্পায়ন', 'বেকারের চাকরির ব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রচারের মায়াজাল সৃষ্টি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে প্রয়াস সিপিএম নেতৃত্ব করেছে, তার বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছে এস ইউ সি আই। দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণদাবী'তে এ সম্পর্কে ধারাবাহিক নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যব্যাপী অসংখ্য জনসভা-পথসভা সংগঠিত হয়েছে। জনগণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র, বুলেটিন ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বর্তমান সংকলনে গণদাবীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, দলের একটি হ্যান্ডবিল এবং বিভিন্ন জনসভায় রাজ্য নেতৃবৃন্দের এবং এই সময়ে প্রকাশিত রাজ্য কমিটির বিবৃতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কৃষি ও বাস্তুজমি রক্ষার আন্দোলন সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে জনগণকে সাহায্য করবে। এস ই জেড সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিবৃতি এই সঙ্গে দেওয়া হল।

২৪ এপ্রিল, ২০০৭
এস ইউ সি আই অফিস
৪৮ লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

মানিক মুখার্জী

সিঙ্গুর

প্রথম সর্বদলীয় সভাতেই এস ইউ সি আই কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছিল

সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিষয়ে আলোচনার জন্য ৪ অক্টোবর, ২০০৬ মহাকরণে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার যে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিল তাতে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য, বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। কমরেড মানিক মুখার্জী জানান, চাষীর জমি কেড়ে নেওয়ার সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর তোলা যুক্তিগুলির যথাযথ কোনও উত্তরই মুখ্যমন্ত্রী বা শিল্পমন্ত্রী সেদিন দিতে পারেননি।

সর্বদলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী, কী পরিমাণ কৃষিজমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন তার একটি হিসাব দিয়ে বলেন যে, কৃষিজমিতে শিল্প হোক এ তাঁরা চান না, কিন্তু অবস্থানগত কিছু সুবিধা থাকায় টাটারা সিঙ্গুর ছাড়া অন্য কোথাও কারখানা খুলতে রাজি হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা সিঙ্গুরের কৃষিজমি অধিগ্রহণ করতে চলেছেন।

পাল্টা যুক্তি তুলে এস ইউ সি আই-এর পক্ষে কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, বর্তমান বিশ্বে শিল্পপতিরা যেখানে কারখানা স্থাপন করে সেখানে নিজেরাই প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে নেয়। সরকার চাইলে টাটারা এরাজ্যের অন্য অঞ্চলে তা করতে পারত। তিনি বলেন, আমরা কারখানা স্থাপনের বিরোধী নই, কিন্তু সিঙ্গুরের যে কৃষিজমি টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকার করছে তা অত্যন্ত উর্বর, বেশির ভাগ জমি তিন ফসলি, এমনকী চার ফসলি। এ সমস্ত জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে গেলে শুধু যে কৃষক ও খেতমজুরদের সর্বনাশ হবে তাই নয়, দেশে খাদ্যসঙ্কটের সৃষ্টি হবে এবং জনগণের রক্ত জল করে উপার্জন করা অর্থের বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে। তাই আমাদের বক্তব্য, সিঙ্গুরে নয়, রাজ্যের অন্য অনুর্বর জমিতে টাটারা কারখানা স্থাপন করুক। কমরেড মুখার্জী বলেন, সিঙ্গুরের মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে গিয়ে অধিগ্রহণ করতে চাওয়া জমির যে হিসাব আমরা পেয়েছি, সরকারের পেশ করা খাতায়-কলমে দেওয়া হিসাবের সঙ্গে তা

মিলছে না। এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন যে, জমির সরকারি হিসাবে গরমিল থাকা অসম্ভব নয়।

সিঙ্গুরে টাটার কারখানা হলে কীভাবে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের বান ডাকবে এবং রাজ্যের প্রবল উন্নয়ন হবে তার যে ফিরিস্তি শিল্পমন্ত্রী দেন, সে প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় কমরেড মুখার্জী বলেন যে, টাটার মোটর কারখানা হলে আর্থিক লাভ হবে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের, কিন্তু ক্ষতি হবে অসংখ্য জনসাধারণের। ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, টাটারা যে নিজেদের কারখানায় জমি থেকে উৎখাত হওয়া চাষীদের চাকরি দেবে না, একথা তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে তারা রাজি হয়েছে। তাছাড়া অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন মোটরগাড়ি কারখানায় কর্মসংস্থানের বিরাট কোনও সুযোগই থাকবে না। তিনি বলেন, টাটাদের ইতিহাস আমরা জানি। তাই বলা চলে, তাদের কারখানায় যে অল্প সংখ্যকের কর্মসংস্থান হবে, তাদের ভবিষ্যতও নিরাপদ নয়। জামশেদপুর সহ টাটাদের মালিকানাধীন কারখানাগুলিতে ইতিমধ্যেই কোথাও ৫০ শতাংশ, কোথাও বা দুই-তৃতীয়াংশ কর্মী কর্মচ্যুত হয়েছেন।

বলাবাহুল্য, মন্ত্রীরা কমরেড মুখার্জীর বক্তব্যের বিরোধিতায় কিছু বলতে পারেননি।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এস ইউ সি আই ছাড়া অন্য কেউই সিপিএম-সরকারের বক্তব্যের কার্যত বিরোধিতা করেনি। কিছু গুরুত্বহীন প্রস্তাব তোলা ছাড়া কংগ্রেস জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধতায় বস্তুত নির্বাক ছিল।

টাটাদের সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা যতদূর এগিয়ে গেছে তাতে আর পিছু হঠা সম্ভব নয় — এ কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত দলীয় প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিষয়টি কোনও বিরোধিতা না করে সমর্থন করেন। কমরেড মানিক মুখার্জী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে, এ মেনে নেওয়া এস ইউ সি আই-এর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সভার পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। কমরেড মুখার্জী মন্তব্য করেন, শাসকদলের পক্ষ থেকে জমি অধিগ্রহণকে সমর্থন করা হ'ল, সাধারণ মানুষ ও তাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে নয়। মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, এই পথে হেঁটে রাজ্য সরকার খেটেখাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার বিনিময়ে টাটাদের জমি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সরকার এত সহজে কৃষিজমি কেড়ে নিতে পারবে না। মানুষ রক্ত ঢেলে, প্রাণ দিয়ে চাষের জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধতা করবে।

('গণদাবী' ১৩ অক্টোবর '০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত)

শিল্পায়নের ধোঁকা দিয়ে চাষীকে ভিখারি করার ষড়যন্ত্র

সঙ্কটজর্জরিত দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর থাবা নেমে এসেছে এদেশের উর্বর কৃষিজমির ওপর। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে এবং এমনকী পশ্চিমবঙ্গে উর্বর কৃষিজমির মতো অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এ কাজে অন্যান্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস, বিজেপি বা সমাজবাদী পার্টির মতো চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলির পাশাপাশি তথাকথিত মার্কসবাদী সিপিএমও লক্ষ লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপন্ন করে, উর্বর কৃষিজমি তুলে দিতে চাইছে টাটা, আম্বানি, সালিমদের মতো বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের হাতে।

এই কাজ করতে গিয়ে গণপ্রতিরোধের সামনে পড়ে সিপিএম নেতৃত্বের বামপন্থী বুলি এবং মার্কসবাদের মুখোশ ঘুচে গিয়ে তাদের পুলিশ ও গুণ্ডানির্ভর স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র বেরিয়ে এসেছে। পুলিশ এবং ক্রিমিনাল দিয়ে পিটিয়ে, ঘরে আগুন দিয়ে এবং ক্রমাগত মিথ্যা বলে বলে মানুষকে শিল্পায়নের মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে তারা একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। ভুল পথে হলেও পুরনো দিনের যেসমস্ত বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই দলটি গড়ে উঠেছিল, তাঁদের স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আজ সিপিএম নেতৃত্ব দলকে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী টাটা-সালিম-আম্বানি-জিন্দালদের বেতনভোগী লাঠিয়ালের দলে পরিণত করতে চাইছেন। সেই সাথে বৃহত্তর জনসমাজকে বিভ্রান্ত করতে তাঁরা রাজ্যে শিল্পায়নের ধুয়ো তুলেছেন।

শিল্পায়নের ধোঁকা দেওয়ার এই চেষ্টাটাও নতুন কিছু নয়। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের সুযোগে বিশ্বায়নের যে বোঝাটা দুনিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তিগুলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে মেহনতি জনতার উপর চাপাবার চেষ্টা করছে, শিল্পায়নের এবং উন্নয়নের ধোঁকাটা তাদেরই তৈরি। সিপিএম নেতৃত্ব দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে সেই ধোঁকাটাই দিচ্ছে নিজস্ব কায়দায়। বিশ্বজোড়া তীব্র মন্দায় আক্রান্ত জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ যেন নবযৌবন ফিরে পাচ্ছে — এমন একটা ভাব দেখিয়ে, বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ-বিশ্বায়নের যে সর্বনাশা নীতি চাপিয়ে দিয়েছে, তা তারা শিল্পায়ন ও উন্নয়নের মোড়কেই পরিবেশন করেছে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নির কুখ্যাত এই দুই সংস্থার সুরে সুর মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমস্বরে সিপিএম নেতৃত্বও এ রাজ্যে শিল্পায়ন ও উন্নয়নের ধুয়ো তুলছে।

সিপিএম নেতৃত্ব বলছে ঃ

১। রাজ্যে শিল্পায়নের জন্যই তারা কৃষিজমি নিচ্ছে। কৃষি এখন আর তত লাভজনক নেই, তাই কৃষকরা উপযুক্ত দামে স্বেচ্ছায় জমি দিয়ে দিচ্ছেন।

২। শিল্প হলে তবেই কর্মসংস্থান হবে। কাজেই কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প করতেই হবে।

৩। কৃষিভিত্তি থেকে শিল্পভিত্তিতে উত্তরণ হ'ল সামাজিক অগ্রগতির নিরিখ। সেই অগ্রগতির পথেই তারা পা বাড়াচ্ছে।

৪। রাজ্যে যেহেতু অনাবাদী জমি যথেষ্ট নেই, তাই শিল্পায়নের অপরিহার্য কাজটা করতে কৃষিজমি নিতেই হবে।

৫। এজন্য খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি হবে না, কারণ বাকি জমির উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়ে বা পতিত জমিকে চাষযোগ্য করে তারা ঘাটতি পূরণ করে দেবে। দেখা যাক্, তাদের এই মন্তব্য কতটা যুক্তিগ্রাহ্য ও সত্য।

পুঁজিপতিদের স্বার্থে সরকারের মদতেই কৃষিকে অলাভজনক করা হয়েছে

রাজ্য সরকার দেখাতে চাইছে — কৃষি এখন আর লাভজনক নেই, তাই জমি ছেড়ে দিলেই কৃষকের লাভ। তাছাড়া শিল্পই হচ্ছে একটা দেশের উন্নতির লক্ষণ, শিল্প গড়ে উঠলে তবেই চাষী কাজ পাবে। তারা আরও বলছে, চাষীর ছেলে কি চাষীই হবে? সে কি শিল্পশ্রমিক-অফিস কর্মচারী হবে না? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যত চাষী উচ্ছেদ হবে, সকলেই কি কাজ পাবে? বিশেষত আজকের উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পে কতজনের কর্মসংস্থান হতে পারবে? তাছাড়া এই ধরনের শিল্পে মুষ্টিমেয় যে কর্মসংস্থান হবে, সেই কাজ করার দক্ষতাই বা সাধারণ চাষীরা কোথায় পাবেন ? সেজন্য সাধারণ ট্রেনিংয়েও কাজ হবে না। প্রচুর টাকা খরচ করে উচ্চ প্রযুক্তির ট্রেনিং নিতে হবে। ফলে চাষীকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করলেও কঠোর বাস্তবের আঘাতে চাষী দেখছে, জমি গেলে চাষীর ভিখারি হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বাজারে খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্রমাগত বাড়া সত্ত্বেও চাষ অলাভজনক হয়ে পড়ছে কেন? তার জন্য কি চাষী দায়ী? মরশুমে ফসলের দাম না পেলেও সেই ফসলই চাষীকে পরে বাজার থেকে চড়া দামে কেন কিনতে হচ্ছে? সরকার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সার-বীজের ওপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়ে পুঁজিপতিদের কাছে চাষীকে অবাধে লুঠ করার রাস্তা খুলে দিয়েছে। ফলে, দেশি-বিদেশি মালটিন্যাশনাল সার, বীজ, কীটনাশক প্রস্তুতকারকরা অবাধে দাম বাড়িয়ে চাষের খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাজারে খাদ্যশস্যের দাম চড়া, অথচ চাষী দাম পাচ্ছে না। তার পরিশ্রমে তৈরি ফসল বেচে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীরা ফুলেফেঁপে উঠছে। যখন সিঙ্গুরের মাঠে জ্যোতি আলু বিক্রি হয়েছে ৫০ কিলোর প্যাকেট ১৩৫ টাকায়, অর্থাৎ ২ টাকা ৭০ পয়সা কিলোতে। সেই আলু সিঙ্গুরের বাজারে তখন ৪ টাকা ৫০ পয়সা এবং কলকাতায় ৫ টাকা কিলো দরে

বিক্রি হয়েছে। কেন খাদ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা এইভাবে চাষীর অভাবের সুযোগ নিয়ে সস্তায় ফসল বেচতে বাধ্য করে পরে চড়া দরে বেচে বিপুল মুনাফা করতে পারছে। চাষীদের প্রতি দরদ থাকলে সিপিএমের উচিত ছিল, এই বঞ্চনা থেকে চাষীদের রক্ষা করা। তার জন্য প্রয়োজন ছিল, সরাসরি চাষীর কাছ থেকে ন্যায্য দামে ফসল কিনে ন্যায্য দামে বিক্রির সরকারি ব্যবস্থা, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পাইকারি ও খুচরো দুই স্তরেই গড়ে তোলা। এই দাবি কংগ্রেসী আমলে যুক্ত খাদ্য আন্দোলনের সময় থেকে আমাদের দল করে আসছে। কিন্তু চাষীকে বাঁচানোর এই নিশ্চিত পথটা ডান অথবা তথাকথিত অন্যান্য বাম দলগুলি কেউই গ্রহণ করেনি। বছরের পর বছর চাষী চোখের জল ফেলেছে, ক্ষোভে ফসল পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সংগঠিত লড়াইয়ের অভাবে সরকারি চক্রান্ত বানচাল করে ফসলের ন্যায্য দাম আদায় করতে পারেনি। এহেন অবস্থায়, যেখানে সরকারের কর্তব্য ছিল সর্বশক্তি নিয়ে চাষীর পাশে দাঁড়ানো, সেখানে সিপিএম করছে ঠিক উল্টোটা। কংগ্রেস আমল থেকে চলে আসা কৃষিপণ্যের মজুতদারি সিপিএমের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও ফুলেফেঁপে উঠেছে। সরকারি মদতে একদিকে হিমঘর মালিক-মজুতদারদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে চাষী মরেছে। এখন সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কৃষিকে অলাভজনক বলে চিহ্নিত করে সেই অজুহাতে তারা চাষীর জমি কাড়ছে। চাষীকে তারা এমন অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে, যাতে নিরুপায় চাষী জমি দিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

প্রকৃত শিল্পায়ন আজ হতে পারে না কেন

চাষী যদি দেখত, সত্যিই একের পর এক কলকারখানা গড়ে উঠছে এবং শিল্পে সে বিকল্প জীবিকা পাচ্ছে, তাহলে তার এত আতঙ্ক হতো না। কিন্তু হলদিয়া-বক্রেশ্বর-ফলতা-রাজারহাটের অভিজ্ঞতার নিরিখে চাষী জানে, বিকল্প কর্মসংস্থান হবে না। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, বাঁধ, পথঘাট করতে জমি থেকে যত মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের মাত্র ৯ শতাংশের পুনর্বাসন হয়েছে। বাকি ৯১ শতাংশের হয়নি। (তথ্যসূত্র ঃ অস্কার ফার্নান্দেজের রচনা, টাইমস অব ইন্ডিয়া, ১৩-১২-০৬)

বস্তুত ইতিহাসের গতিপথে পুঁজিবাদ আজ সঙ্কটজর্জরিত, এটা পুঁজিবাদের মরণদশার যুগ। তাই গোটা দুনিয়ায় কোথাও শিল্পায়ন হচ্ছে না। যা হচ্ছে তা হ'ল, প্রধানত পুরনো কারখানার মালিকানা বেচাকেনা, যেমন টাটারা কিনেছে কোরাস; অথবা 'মার্জার' — দুটো শিল্প মিলে গিয়ে পুঁজির শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো। 'শিল্পায়ন' কথাটার একটা সুনির্দিষ্ট মানে আছে। বহু ক্ষুদ্রপুঁজিকে গিলে, বহু কলকারখানাকে লাটে তুলে একচেটিয়া গোষ্ঠীর মালিকানায় দু'চারটে শিল্পস্থাপন এবং হাজার-হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করে দু-একশো নতুন চাকরি পুঁজিবাদে সর্বদা হয় — এর নাম শিল্পায়ন নয়, এর নাম আরও একচেটিয়াকরণ।

তাই দেখা যাচ্ছে, সিপিএম নেতৃত্ব এ রাজ্যে যাদের হাত ধরে শিল্পায়নের ধোঁকা দিচ্ছে সেই টাটা, আম্বানি, সালিমরা সবাই একচেটিয়া মালিক। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ক্ষুদ্রশিল্প ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল ও হোসিয়ারি ধুঁকছে। চা-বাগানের অবস্থাও শোচনীয়। মার্কসবাদ দেখিয়েছে — মুনাফাবৃদ্ধির জন্য মালিকরা চুরিচামারি-দাগাবাজি বাদে দু'রকম রাস্তা প্রধানত নেয়। প্রথমত, তারা শ্রমিকদের খাটুনির সময় বাড়াতে চায়। দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন প্রযুক্তি এনে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াতে চায় এবং মজুরি বাবদ খরচ কমিয়ে উৎপাদন খরচ কমাতে চায়। প্রথম রাস্তায় পা দিয়ে তারা শ্রমআইন উড়িয়ে দিয়ে বারো-চোদ্দ-ষোল ঘণ্টা খাটাবার চেষ্টা করে। সেটা তারা এখন খুব স্পষ্টভাবে করছে আই টি শিল্পে, এসইজেড এলাকায় এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা শিল্পে। দ্বিতীয় রাস্তায়, তারা পুরনো কলকারখানা তুলে দিয়ে দু'চারটে নতুন প্রযুক্তির কারখানা করে, যেখানে অল্প লোককে খাটিয়ে তারা বিপুল মুনাফা করে। পুঁজিপতিদের নিরন্তর এ কাজটা করে যেতে হয়। তাই পুঁজিবাদে সর্বদাই পুরনো শিল্প বন্ধ হয়ে দু'চারটে নতুন শিল্প হয় — যা শিল্পায়নের নয়, শিল্পক্ষেত্রে সঙ্কটেরই লক্ষণ।

মার্কস দেখিয়েছেন — পুঁজিবাদের ভিতরের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত মুনাফার হারের পতনের ঝোঁককে কাটাবার জন্য ক্রমাগত পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদনকে যে হারে বাড়ায়, বাজারকে সেই হারে বাড়াতে পারে না। পুঁজির মালিক লাভের জন্য ক্রমাগত পুঁজি ঢেলে আধুনিকীকরণ করে, উৎপাদন বাড়ে দ্রুত হারে, কিন্তু শ্রমিক কমে। দু'চারজন মোটা মাইনের প্রযুক্তিবিদ চাকরি পেলেও বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে, তাদের কেনার ক্ষমতা থাকে না। যাদের চাকরি থাকে তাদেরও ওয়েজ ফ্রিজ, ওয়েজ কাটের ফলে ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে বাজারের তুলনায় অতি উৎপাদনের সঙ্কট দেখা দেয়, চাহিদার অভাবে শিল্পে আসে মন্দা। মার্কস আরও দেখিয়েছেন, সঙ্কটের আবর্তে পড়ে মুনাফার জন্য পুঁজি আরও দুটো রাস্তা নেয়। একটা হ'ল প্রতারণা-জোচ্চুরি-ঠকবাজির রাস্তা। ব্যক্তিমালিক অসৎ বলে শুধু নয়, সর্বোচ্চ মুনাফার অন্য পথ বন্ধ বলেই পুঁজি জুয়াচুরির পথে যায়। দ্বিতীয় পথ যেটা মার্কস দেখিয়েছেন, তা হ'ল, বিনিয়োগ-উৎপাদন-বিক্রি-মুনাফা (M-C-M') এই পথ ছেড়ে, পণ্য উৎপাদন না করে অন্য রাস্তায়, শেয়ারে ফাটকা বা জুয়াচুরির পথে টাকা দিয়ে টাকা ধরার (M-M') রাস্তায় পুঁজিবাদ যায়। মার্কস যখন এটা দেখান, পুঁজিবাদ তখনও তার প্রথম অবস্থায়। তাতেই পচনের লক্ষণগুলি মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে ধরা পড়েছিল। মার্কসের শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ও নিজস্ব সৃজনশীলতার দ্বারা লেনিন দেখান — বিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজি ক্রমশ উৎপাদন থেকে আরও সরে এসে সুদখোর চরিত্র নিচ্ছে শুধু নয়, সেইটাই ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করছে। মার্কস-এর

সময় এই লক্ষণটা অনেকটা গৌণ ছিল। লেনিন দেখান, সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজির এই পরজীবী সুদখোর চরিত্র একটা মুখ্য ধারায় পরিণত হয়েছে। লেনিন পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদের সঙ্কট আরও বেড়েছে। লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে স্ট্যালিন দেখান — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পুঁজিবাদ তৃতীয় তীব্র বিশ্বসঙ্কটে পড়ে তার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব খুইয়েছে। মার্কসবাদের মহান শিক্ষকদের শিক্ষার ভিত্তিতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই দলের জন্মলগ্নেই দেখিয়েছেন — পুঁজিবাদের বিশ্বজনীন সঙ্কট ও ক্ষয়ের যুগে গড়ে-ওঠা ভারতীয় পুঁজিবাদ জন্ম থেকেই পঙ্গু; সরকারি সাহায্য, ভরতুকি, বুনিয়াদী শিল্পে ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের মদতে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি শক্তিসঞ্চয় করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে বেড়ে উঠেছে। অন্যদিকে ক্রমাগত শোষণের ফলে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। ফলে শিল্প গড়ে উঠছে না, প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিও উৎপাদন ক্ষমতার পুরোটা কাজে লাগাচ্ছে না। পুঁজিবাদের ক্ষয়ের লক্ষণগুলি এদেশে এখন প্রকট। দেখুন, যে টাটা 'কোরাস' কিনে বিশ্বে দু'নম্বর ইস্পাত নির্মাতা, তারাই জামশেদপুরের কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটি টন হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন করছে ৫০ লক্ষ টন। (অমিতাভ গুপ্তর রচনা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮-২-০৭)। পুঁজি এখন কৃষি ও শিল্প — এই প্রধান দুই উৎপাদনী ক্ষেত্র ছেড়ে পরিষেবা, রিয়েল এস্টেট, শেয়ার ফাটকায় বেশি বেশি করে নিয়োজিত হচ্ছে। অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর আশায় অর্থের যোগান বাড়াতে গেলেই মুদ্রাস্ফীতি বিপজ্জনক চেহারা নিচ্ছে। কর ছাড়, সস্তায় জমি-জল-বিদ্যুৎ আদায় এবং শ্রমআইন লঙ্ঘন করা ছাড়া পুঁজিবাদ টিকতে পারছে না। এহেন সঙ্কটময় পরিবেশে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে বিপুল সংখ্যক কারখানার ধ্বংসস্তূপের উপর যে দুটো-একটা কারখানা হচ্ছে তাকে শিল্পায়ন বলা চলে না। এই অবস্থায় পুঁজিবাদী পথে শিল্পায়ন বা উন্নয়নের কথা বলে জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার কাজটা একমাত্র পুঁজিবাদের নিকৃষ্ট দালালরাই করতে পারে। সিপিএম নেতারাও কি তাই-ই করছেন না ?

কৃষি থেকে শিল্পভিত্তিতে উত্তরণের ধোঁকাবাজি

তাত্ত্বিক ঢংয়ে সিপিএম নেতারা বলছেন — কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা কমে শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রগতির লক্ষণ এবং তাঁরা সেইদিকেই যাচ্ছেন এবং সেজন্যই কৃষিজমি কেড়ে শিল্প তৈরি করছেন। অথচ সকলেই জানেন, যে দু'একটি কলকারখানা হচ্ছে তা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, এখানে চাকরির সুযোগ সামান্য। সিপিএম বলেছিল, হলদিয়া পেট্রোকেমে দু'লক্ষ মানুষের কাজ হবে। বাস্তবে সরকারি তথ্য অনুযায়ী সরাসরি সেখানে চাকরি হয়েছে ৬০০ জনের মতো, অনুসারী শিল্পে হাজার কুড়ি, তার মধ্যে হাজার পাঁচেক অন্য রাজ্যে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ ৫১৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সাড়ে ৮

কোটি টাকা বিনিয়োগে মাত্র ১ জনের সরাসরি চাকরি হয়েছে। অনুসারী শিল্প ধরলে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে চাকরি হয়েছে একজনের। সিপিএম নেতারা এখন উন্নয়নের প্রচারে কেবলই কত বিনিয়োগ হচ্ছে তার হিসাব দিয়েই থেমে যাচ্ছেন। কত চাকরি হচ্ছে, সে সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করছেন না। তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে — ১৯৯১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ১৪ বছরে বিনিয়োগ হয়েছে ২৯,১৯৫ কোটি টাকা। চাকরি হয়েছে ৭১,২১৬ জনের (সূত্র ঃ টেলিগ্রাফ ১৪-৪-০৫)। অর্থাৎ বছরে ২০৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগে মাত্র ৫০৮৬ জনের চাকরি হয়েছে।

রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার ৭৫ লাখ (গণশক্তি ৩-৮-০৫)। গড়ে বছরে এক-দেড় লাখ নতুন বেকার সরকারি খাতায় নাম লেখাচ্ছে। এর ওপর ক্লোজার হয়ে, ছাঁটাই হয়ে পথে বসছে কতজন কে তার হিসাব রাখে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, নতুন বেকার কেউ হচ্ছে না, তবুও ইতিমধ্যে নাম লেখানো ৭৫ লক্ষ বেকারের চাকরি দিতে ভারতের সমস্ত সম্পদ, প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকাই লেগে যাবে। তারপর প্রশ্ন উঠবে, সেই শিল্পের বিপুল উৎপাদন কিনবে কে? তার ওপর সাধারণ মানুষ এসব শিল্পে কাজ পাবে না। সিঙ্গুরে মোটর কারখানায় জমিচ্যুত সকলকে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি টাটারা দেয়নি। সরকারি নেতারাও জানেন, কারখানায় সকলকে কাজ দেওয়ার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তাই তাঁরা বলছেন, কারখানার সঙ্গে আবাসন হলে সিকিউরিটি গার্ড, পরিচারিকা দরকার হবে। টাটার উৎপাদিত বছরে ১ লক্ষ গাড়ির জন্য ড্রাইভার লাগবে; বাস্তবে ধোপা, নাপিত, গৃহভৃত্য সবই লাগবে। চাষ ছেড়ে ধোপা বা নাপিতের পেশা নেওয়া, গার্ড, ড্রাইভার বা পরিচারিকা হওয়ার অর্থ কি কৃষি উৎপাদন থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প উৎপাদনে যোগ দেওয়া? চাষী থেকে গৃহভৃত্য বা ভিক্ষুক হওয়ার যে রাস্তা সিপিএম নেতারা শিল্পায়নের নামে দেখাচ্ছেন, তাতে জনগণ যে সেই রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করবে এটাই স্বাভাবিক, হচ্ছেও তাই।

পুঁজিবাদী বিশ্বে একটা কথা চালু হয়েছে — 'জবলেস গ্রোথ'। কর্মসংস্থানহীন আর্থিক প্রবৃদ্ধি। সিপিএমও বলছে, বিশ্বে এবং গোটা ভারতে জবলেস গ্রোথ হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নাকি তা হচ্ছে না। গোটা বিশ্ব এবং গোটা দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ পশ্চিমবঙ্গে কী করে কর্মসংস্থানমুখী গ্রোথ হচ্ছে? সিপিএম নেতারা বলে এসেছেন, তাদের সরকারের জনমুখী নীতির ফলেই নাকি এটা সম্ভব হচ্ছে। একটা রাজ্য সরকারের নীতি কী করে গোটা দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য কুফলকে ঠেকাতে পারে — কোন্ মার্কসবাদ একথা শেখায় তা সিপিএম নেতারাই বলতে পারেন। চরম শোধনবাদীরাও এত বড় মিথ্যা বলতে পারে না এবং বলেনি। তথ্যের নিরিখে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৮ -২০০৩ এই পাঁচ বছরে দেশে সংগঠিত

শিল্পে ৪.১৪ শতাংশ কর্মসংস্থান কমেছে। ১৯৯৫-২০০৫ — এই দশ বছরে বিশ্বে ১৫ শতাংশ কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৩-৯৪ সালে কর্মক্ষম জনসংখ্যার ১০.০৬ শতাংশ বেকার ছিল। ১৯৯৯-২০০০ সালে তা বেড়ে ১৪.৯৯ শতাংশ হয়েছে। রাজ্যের নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা গড়ে বছরে দেড় লক্ষ হারে বেড়ে চলেছে। সরকারি দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ, হাজার হাজার পদ খালি পড়ে আছে। পুঁজিবাদের সঙ্কটই যে এর কারণ, সেটা সিপিএম গোপন করছে এবং দেখাচ্ছে পুঁজিপতিরাই দেশের ত্রাতা। মার্কসবাদের বুলি আওড়ে এভাবেই তারা মালিকদের সেবা করছে।

ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর স্বাধীন ভারতে পুঁজির দ্রুত কেন্দ্রীভবন এবং একচেটিয়াকরণ পুঁজিবাদী সঙ্কটকে বাড়াতে থাকে। হিসাবে দেখা যায়, ৫১টি বৃহৎ প্রাইভেট কোম্পানির মোট সম্পদ ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১০০০ কোটি টাকা, ১৯৮৩-৮৪ সালে তা বেড়ে হয় ১১,৬৮৩ কোটি টাকা, বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩৬ শতাংশ। টাটা গোষ্ঠীর সম্পদ ১৯৭২ সালে ছিল ৬৪২ কোটি টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে তা হয়েছে ৮৫৩১ কোটি টাকা; অর্থাৎ ১৭ বছরে সম্পদ বেড়েছে ১৩.২৮ গুণ। কিন্তু এ কেবল একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেই সত্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজি মার খেয়েছে। ১৯৯৪ থেকে ২০০০-২০০১ পর্যন্ত পাঁচ বছরে দেশের বৃহত্তম ১০০টি একচেটিয়া কোম্পানির লাভ বেড়েছে ৮.০৯ শতাংশ। অন্যদিকে তালিকার ৫০১ থেকে ৮০০ স্থানের ৩০০ কোম্পানি লোকসান খেয়েছে; গড় মুনাফা বৃদ্ধি হয়েছে ৩.৩ শতাংশ। মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানিগুলি ১৯৭০ সালে গড়ে ২৩.৮ শতাংশ লাভ করেছে, যা ২০০৩ সালে ১২.৭ শতাংশে নেমেছে। তাই বলে শেষ অবধি তাদের মুনাফা কমেছে কি? না, তা কমেনি। সরকার ভরতুকি দিয়ে, উৎসাহ ভাতা দিয়ে মুনাফা বাড়িয়ে দিয়েছে।

১৯৮০-র দশক থেকেই এদেশে সঙ্কটগ্রস্ত একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া, করছাড় ইত্যাদির দাবি তুলছিল। ১৯৮৪ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে এদেশে অর্থনীতির বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। ১৯৯১ সালে এদেশে নয়া আর্থিক নীতি বা উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চালু হয়। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এই নীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল — মুক্ত বাজার ও বিনিয়ন্ত্রণের বচনের আড়ালে একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলির প্রতি অঢেল সরকারি আনুকূল্য ও ভরতুকি। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০০-০১ এই পাঁচ বছরে ১০০০ কোম্পানির লাভ-লোকসান পর্যালোচনা করে দেখায় — যারা সংরক্ষণের সুযোগে পুষ্ট হয়েছিল তাদের মধ্যে গোয়েঙ্কা, বিড়লা, মহিন্দ্র, থাপার প্রভৃতি পুঁজিপতিগোষ্ঠী খানিকটা পিছু হঠে যায়। রিলায়েন্স, হিরো-হোন্ডা, ইনফোসিস, উইপ্রো এই সময়কালে ফুলেফেঁপে ওঠে। এইসব কোম্পানিই বিশেষ করে সরকারি সাহায্যপুষ্ট

রিলায়েন্স ফাটকাবাজারে শুধু টাকা খাটায় তাই নয়, রিলায়েন্সের মালিক আম্বানিরা বিজেপি এবং সিপিএমের খুবই ঘনিষ্ঠ। হিরো-হোন্ডা গুরগাঁওতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিপুল সুবিধা পায়। ইনফোসিস ও উইপ্রো হ'ল তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসা — সব দলের সরকারই এখন এদের মদতদাতা। গোয়েঙ্কা এ রাজ্যে সিপিএমের বদান্যতায় বিদ্যুতের ব্যবসা করে কার্যত মুনাফা নয়, লুঠ করছে। সম্প্রতিকালে এদেশের বৃহৎ একচেটিয়া কোম্পানিগুলি যে লাভ করছে তার প্রধান উৎস হ'ল, সুদের হার কমানোর ফলে সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন বহির্ভূত লগ্নি ব্যবসা থেকে বিপুল লাভ। এহেন পরিবেশে টাটা এরাজ্যে জমি নিচ্ছে মোটরগাড়ি কারখানা করবে বলে। মোটরগাড়ি শিল্পের হাল কী? ''auto-mobiles…continued to reel under demand and price pressure, and their losses continued to mount year after year''. (সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান ইকনমি — দত্ত ও সুন্দরম ২০০৫)। অর্থাৎ চাহিদার অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির চাপে অটোমোবাইল শিল্প লোকসান খাচ্ছে। এ রাজ্যেই বিড়লার হিন্দুস্থান মোটরস লে-অফ করছে, প্রায়ই সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করে দু'দিন বন্ধ দিচ্ছে। কারখানার জমিতে আবাসনের ব্যবসা করছে। এই মন্দা- আক্রান্ত শিল্পে টাটা ঢুকছে বিপুল পুঁজি নিয়ে, তারা খুব কম লোক নিয়োগ করে মুনাফা করতে চায়। তাই কারখানা করার আগেই তারা শর্ত দিচ্ছে, সিপিএমও তাদের শর্ত মেনে সরকারি টাকায় কৃষক উচ্ছেদ করে নামমাত্র দামে সিঙ্গুরে টাটাকে জমি দিচ্ছে। বাকি শর্তগুলি এতই জনবিরোধী যে, রাজ্য সরকার তা 'ট্রেড সিক্রেট' আখ্যা দিয়ে গোপন করছে। ফলে এই সন্দেহ অনেকের মধ্যে দানা বাঁধছে যে, টাটাদের সঙ্গে সিপিএমের গোপন লেনদেন কিছু হয়নি তো?

সিপিএম কি সত্যিই শিল্পায়ন চায়

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন — টাটাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে তাঁরা দেবেন না। পরে তিনি বলেছেন — তিনি শুধু টাটার নয়, সকল শিল্পপতিরই প্রতিনিধি। অর্থাৎ, শিল্পপতিদের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা তাঁর কর্মসূচি। এই কাজটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস, বিজেপি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীভিত্তিক বুর্জোয়া দলও করছে। কিন্তু এখানে মূল যেটা প্রশ্ন, তা হ'ল — বর্তমান তথাকথিত শিল্পায়নের ক্যানভাসে কেবল বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই দেখা যাচ্ছে কেন? ইতিমধ্যেই সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে, শিল্পস্থাপনের জন্য জমি চেয়েও কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতি সরকারি সাহায্য পাননি।

কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম — যারা 'শিল্পায়নের' কথা বলছে, তারা কি সত্যিই শিল্পায়ন চাইছে? তা যদি হতো, তবে সর্বপ্রথম তারা খতিয়ে দেখতো শিল্পায়নের সামনে মূল বাধাটা কী? দেশে ক্রমাগত শিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ছে, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে

এমন বন্ধ কারখানার সংখ্যা ৫৬ হাজার। গোটা ভারতবর্ষেই কলকারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ছে। দেশে ১৯৮০ (ডিসেম্বর) সালে ছোট বড় রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা ছিল ২৪,৫৫০টি, ১৯৯৬ (মার্চ) সালে তা বেড়ে হয়েছে, ২,৬৪,৭৫০। এসব কারখানায় লক্ষ লক্ষ একর জমি পড়ে আছে। রাজ্য সরকার নিযুক্ত 'ওয়েবকনের' সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মাত্র ৫০০ বন্ধ কারখানায় ৪১ হাজার একর জমি পড়ে আছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.১.০৭) এসব পড়ে থাকা জমিতে 'শিল্পায়ন' হচ্ছে না। বৃহৎ একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি এখন চাইছে শহরের কাছাকাছি উর্বর জমি; কেন চাইছে সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

আমাদের দেশে শিল্পায়নের সামনে প্রধান বাধা হ'ল — মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাব, যার মূলে আছে পুঁজিবাদী শোষণ। তাই পুঁজিবাদকে খতম না করলে শিল্পায়ন সম্ভব নয়। এই সত্যটি ভালভাবে না বুঝলে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম — কারও রাজনীতিই বোঝা যাবে না। মনে রাখা দরকার, এ রাজ্যে যেমন ক্ষমতাসীন সিপিএম চাষীর জমি কাড়ছে, অন্য রাজ্যে কংগ্রেস, বিজেপি — যার সহযোগী তৃণমূল — তাই-ই করছে। আবার এরাজ্যে কংগ্রেস-তৃণমূল কৃষিজমি দখলের বিরোধিতা করছে, অন্য রাজ্যে সিপিএম এর বিরোধিতা করছে। ভোটে গদি দখলের লড়াইয়ে ক্ষমতায় বা বিরোধীপক্ষে থাকার জন্য একই দল দু'রাজ্যে দু'রকম ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু শিল্পায়নের যেটা মূল বাধা সেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কেউই বলছে না, একমাত্র এস ইউ সি আই ছাড়া। একমাত্র আমাদের দলই সঠিক সত্যটা বলছে — পুঁজিবাদকে খতম করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করলে শিল্পায়ন ঘটানো যাবে না।

কংগ্রেস, বিজেপি বা তৃণমূল প্রত্যেকেই জনগণকে বোঝাচ্ছে — পুঁজিবাদের আওতায় শিল্পায়ন সম্ভব, তবে যেভাবে চাষীর সম্মতি ছাড়া মেরেধরে কৃষিজমি নেওয়া হচ্ছে তার পদ্ধতি বা জমি বাছাই নিয়ে তাদের পার্থক্য রয়েছে। আমরা পরিষ্কার বলেছি — যা হচ্ছে, তা শিল্পায়ন নয়। পুঁজিবাদের বর্তমান অবক্ষয়ের পর্যায়ে বিশ্বের কোথাও শিল্পায়ন হচ্ছে না। পুঁজিবাদের সঙ্কটের জন্যই ভারতের কোথাও বা এ রাজ্যেও শিল্পায়ন হতে পারে না।

উর্বর কৃষিজমি নয় কেন

শিল্পায়ন না হলেও দু-চারটে শিল্প গড়ায় বাধা দেওয়ার কোন কারণ নেই, যদি না তা গরিব মেরে তৈরি হয়। শিল্পের জন্য অনুর্বর অকৃষি জমি আছে, বন্ধ কারখানার জমি আছে। সেখানে শিল্প হোক। মনে রাখা দরকার, কৃষিজমির পরিমাণ নির্দিষ্ট, হাজার হাজার বছরের বিবর্তনে তা তৈরি, তাকে সেচসেবিত করতে জনগণের তহবিল থেকে শত শত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেই জমি শিল্পপতিদের দিলে খাদ্য উৎপাদনে টান পড়বে। সিপিএম বলছে, বাকি কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে।

প্রথমত, চাইলেই যত খুশি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় না, তারও নিয়মকানুন ও সীমা আছে, তার খরচও প্রচুর। সেক্ষেত্রে অনুর্বর জমিতে, বাঁকুড়া- পুরুলিয়ার মতো শিল্পহীন জেলায় শিল্পস্থাপন করা যায়। রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে পতিত জমি ৮ লক্ষ একরেরও বেশি। রাজ্যের কয়েকটি জেলায় শিল্পস্থাপনের দাবি জনগণই তুলছেন। সেখানে শিল্পপতিরা যেতে পারেন। রাজ্য সরকার বলছেন, তাদের প্রায় দেড় লক্ষ একর জমি চাই। নানা সংস্থার হিসাবে অন্তত তার চার থেকে সাত গুণ অকৃষি জমি রাজ্যে আছে। কিন্তু সিপিএম নেতারা বলছেন — সেখানে শিল্পস্থাপনে পুঁজিপতিরা নাকি রাজি নন। সিপিএম বলছে — টাটা বা সালিমরা দক্ষিণবঙ্গের নির্দিষ্ট জমিগুলিই চাইছেন। শিল্প যখন অন্যত্রও হতে পারে তখন শহরের কাছাকাছি, হাইওয়ের ধারে নির্দিষ্ট জমি বাছাই দেখে সকলেই বুঝছেন, কারখানার কথা বলে জমি নিয়ে বাস্তবে শেষপর্যন্ত হবে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা। এখন এই ব্যবসায়ে মুনাফা উচ্চহারে হচ্ছে, তাই মালিকরা এই ব্যবসায়ে আসতে চায়। এ রাজ্যে আসছে ইন্দোনেশিয়ার কুখ্যাত সালিম গোষ্ঠী। অন্যান্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই এদেশের প্রমোটারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মর্গান স্ট্যানলি, মেরিন লিন্চ, জিই কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করছে। (সূত্রঃ সম্পাদকীয়, মান্থলি রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬) রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা ছিবড়ে হয়ে গেলে পরে দরকারে এই জমিতে চুক্তিচাষেও তারা যেতে পারে। এজন্যই এখন পুঁজিপতিরা এস ই জেড-গুলিতে জমি নিচ্ছে এই শর্তে যে জমির একটা অংশে তারা আবাসন করবে। সেটা ৫০ শতাংশ হবে বলছে কংগ্রেস, সিপিএম নেতাদের 'প্রগতিশীল' বিকল্প হল ২৫ শতাংশ। মাছ তেলে না ঘিয়ে ভাজা হবে — এই বিতর্কে মাছের কোন লাভ নেই; তেমনি ৫০ নাকি ২৫ শতাংশে আবাসন হবে তাতে জনগণের বিশেষ লাভালাভ নেই। কাজেই ক্ষতিপূরণ বাড়ানো, বা অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়া ইত্যাদি ফাঁদে পা না দিয়ে স্পষ্টত বলা দরকার, কৃষিজমিতে শিল্প করা চলবে না। [গণদাবীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ : ৫৯ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ১৬-২-০৭]

কৃষিজমি কেড়ে নিলে অনাহার বাড়বেই

পশ্চিমবঙ্গের উন্নততর বামফ্রন্টের ঘোষিত স্লোগান হ'লো, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। কিন্তু 'আমাদের ভবিষ্যৎ' বলতে যে টাটা-আম্বানি-সালিম ইত্যাদি নানা কিসিমের শিল্পপতি ছদ্মবেশী জমি-হাঙ্গরদের ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে, তা জনগণ বিলক্ষণ উপলব্ধি করছেন। কেন না একদিকে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, বারুইপুর, ভাঙড়, ফুলবাড়ি, হরিপুর, জুনপুট, কাওয়াখালি ইত্যাদি রাজ্যের নানা প্রান্তে কৃষিজমি জোর করে অধিগ্রহণ করে উন্নয়নের যে ফানুস ওড়ানো হয়েছে, তার ধাক্কায় ঐসব অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে যেভাবে নির্বিচারে কৃষিজমি অকৃষি কাজে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাতে রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তার (food security) অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। ভূমি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী স্বীকার করেছেন, গত বছরে ৪ লাখ একর কৃষিজমির চরিত্র বদল ঘটেছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮.৭.০৬)

বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ধারকবাহক বিশ্বব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রসংঘের সংস্থাগুলির বড় বড় কথার ঘাটতি নেই। ১৯৭৪ সালের খাদ্য নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ক্ষুধা ও অপুষ্টি নির্মূল করার লক্ষ্যে সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে (১৯৭৪) বলা হয়েছিল, ক্ষুধা থেকে মুক্তি নর-নারী-শিশু নির্বিশেষে সকল মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। খাদ্য নিরাপত্তার প্রথম অর্থ তাই ক্ষুধা থেকে মুক্তির উপযোগী খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যদিও আমরা এর সাথে সেই নিষ্ঠুর সত্যটিকে উল্লেখ করতে চাই যে, শুধুমাত্র উৎপাদন নিশ্চিত করলেই সকলের ক্ষেত্রে খাদ্যনিশ্চয়তা কার্যকর হয় না। ''সকল মানুষ সকল সময়ের জন্য সুস্থ সবল জীবনধারণের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য পাচ্ছে'' — এটাই হল খাদ্যনিশ্চয়তার অর্থ। এ কথা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং বিশ্বব্যাঙ্ক, যা এখন সিপিএমের মডেল, তাদের সংজ্ঞাতেও একই কথা বলা হয়েছে। ('access by all people at all times to enough food for an active and healthy life')। এখন কোনও সরকার যদি তথ্য দিয়ে দেখায় যে, দেশে যা জনসংখ্যা এবং খাদ্য উৎপাদন যতটা হচ্ছে তাতে মাথাপিছু খাদ্যের যোগান যথেষ্ট, অতএব খাদ্যে নিশ্চয়তা আছে, তবে সেটা হবে চালাকি। কারণ দেশে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য আছে মানেই এটা বোঝায় না যে, সাধারণ মানুষ সেই খাদ্য পাচ্ছে। তাই যতক্ষণ না উৎপাদিত খাদ্যশস্য সমাজের সকল স্তরের মানুষ, বিশেষত দরিদ্রতম মানুষ প্রয়োজনীয় পরিমাণে কিনবার মতো ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করছে, অথবা একটা সরকার তা জনগণের সহজলভ্য করার মতো ব্যবস্থা করছে, ততক্ষণ মাথাপিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাপের হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন হ'লেও খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে

উঠেছে, বলা যাবে না। আবার, শুধু অনাহার নিবৃত্ত করার মতো খাদ্যশস্য যোগানের ব্যবস্থা করা গেলেও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পূর্ণ হয় না। কেননা, স্বীকৃত সংজ্ঞানুযায়ী 'অ্যাকটিভ এ্যান্ড হেল্‌দি লাইফ', অর্থাৎ সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকবার উপযোগী অনুকূল পরিকাঠামোর জন্য খাদ্যশস্যের যোগানই একমাত্র নির্ধারক নয়, জীবনধারণের জন্য অন্যান্য ন্যূনতম চাহিদার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করতে হয়। [Food security is not just a matter of food — quality of food ensures nutrition, and healthcare that protects people from debilitating diseases or intestinal parasites that leak nutrition are all part of it. (Radhakrishnan, R. EPW, April 30, 2005; Krishnaraj, M., EPW, June 18, 2005)]। তাই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যনিশ্চয়তা বলতে আমরা বুঝব, রাজ্যবাসী সকল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং সেই খাদ্য যাতে সকল মানুষের কিনবার ক্ষমতার আওতায় থাকে, তা সুনিশ্চিত করা।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সহ বহু স্থানে উর্বর কৃষিজমিকে অকৃষি কাজের জন্য শিল্পপতি নামধারী প্রমোটারদের মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত করার সরকারি উদ্যোগে তাই অনেকেই খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সহযোগী পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব'লে থাকে যে, এ রাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তো বটেই, রাজ্যে উদ্বৃত্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়। ফলে, মানুষের খাদ্যনিশ্চয়তা নিয়ে আশঙ্কার নাকি কোন কারণই নেই। খাদ্যনিশ্চয়তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মাপকাঠিতে তাদের এই দাবি সবদিক থেকেই অসার এবং বাগাড়ম্বর। এমনকী পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদনের যে গল্প তারা বলে তাও প্রকৃতপক্ষে গোঁজামিলের হিসেব।

প্রথমত, রাজ্যে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হ'লে তার দ্বারাই প্রমাণ হয় না উৎপাদন পর্যাপ্ত। কেননা, জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ উপযুক্ত পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতার অভাবে পুঁজিবাদের নিয়মেই খাদ্যের বাজারে চাহিদা সৃষ্টির হিসাবের বাইরেই থাকে। এরা সেই অংশ যারা খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে তাদের সংখ্যা কত তার হিসাব নিলেই বোঝা যাবে যে, এইসব মানুষ যদি সঠিক পরিমাণ খাদ্য পেতেন তাহলে বর্তমানে যে উৎপাদনের পরিমাণ তা পর্যাপ্ত কি না।

উল্লিখিত গবেষকদের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১-৫ বছরের শিশুদের ৪৯.৬ শতাংশ অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং গ্রামে পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের ৪০.৫ শতাংশ এবং মহিলাদের ৪৫.৯ শতাংশ কর্মশক্তির ঘাটতিতে বারোমাসই আক্রান্ত (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৩০-৪-২০০৫)। অর্থাৎ এই সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ করতে পারেন না। উল্লেখযোগ্য

যে, ৩০ বছরের 'উন্নত শাসনে' এই রাজ্যের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা শুধুমাত্র সর্বভারতীয় গড় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি তাই নয়, প্রগতিশীলতার প্রচারের আড়ালে যা সর্বদা প্রচ্ছন্ন থাকে, তা হ'ল, এই সংখ্যা অন্য সব রাজ্য, যেখানে দক্ষিণপন্থীরা সরকার চালায়, তাদের থেকেও বেশি। তাই এ রাজ্যে শুধুমাত্র মাথাপিছু চাল উৎপাদন ১৯৭৭ সালে ৪১৯ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ৪৫৪ গ্রাম হয়েছে, তা দিয়ে এটুকু মাত্র বলা যায় যে, এ রাজ্যে চাল উৎপাদন গত ৩০ বছরে মাথাপিছু ৩৫ গ্রাম মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে স্মরণে রাখা ভালো যে, শুধুমাত্র চালই একমাত্র কৃষিজাত পণ্য নয় যা আমাদের প্রয়োজন — এর সাথে গম, ডাল, ভোজ্যতেল এবং নানাবিধ সব্জিও প্রয়োজন। গম, ডাল ও ভোজ্যতেলে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য এবং এইগুলি এ রাজ্যে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, চাল উদ্বৃত্ত, তবু শুধুমাত্র তা দিয়েই মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে বলা হাস্যকর।

দ্বিতীয়ত, যেকোন জনমুখী সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটাবার ও তা জনগণের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যত্নবান হবে। এজন্য প্রথম কাজ হবে, অসেচ জমিকে সেচের আওতায় আনা, উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার এবং অকৃষি জমিকে কৃষিযোগ্য ক'রে তোলার ব্যবস্থা করা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অকৃষি জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার সম্ভাবনা কতটুকু? জমির পরিমাণের হিসাব থেকে বোঝা যাবে যে, সেই সম্ভাবনা খুবই কম। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে মোট জমির ৪৬.০৭ শতাংশ কৃষির অধীন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ ইতিমধ্যেই ৬২.৮৯ শতাংশ। আবার অকৃষি কাজে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ১৮.৫২ শতাংশ জমি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার পরিমাণ মাত্র ৭.৭০ শতাংশ। এ অবস্থায় সরকার ১,৪৩,৫০০ একর জমি শিল্পস্থাপনের নামে অকৃষিকাজে ব্যবহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে কৃষিকাজের জন্য জমি ব্যবহারের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে কমে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জমির ক্ষুধা মেটাবার জন্য সিপিএম সরকার ঢালাও কৃষিজমি দখল করার যে অভিযানে নেমেছে তা যদি সফল হয়, তবে খাদ্য নিরাপত্তা ধ্বংস হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তা বাস্তব রূপ নেবে। ইংরেজি তুলে দেওয়ার ১৯ বছর পর সেই ভুল স্বীকারের মতো ভুল স্বীকারের বাহানায় এই অপকর্ম চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়ত বামফ্রন্ট করবে। তবে তার আগে সমাজের শত শত প্রান্তিক ও গরিব মানুষকে জীবন দিয়ে সেই ভুলের মূল্য দিতে হবে।

[গণদাবীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ : ৫৯ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ৯-২-০৭]

বিশ্বায়নের পথ ধরেই কৃষিজমি দখল চাষী আন্দোলনকেও পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের পরিপূরক করতে হবে

সিঙ্গুরে কৃষিজমি দখলের পুলিশি অভিযানের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়েছে গোটা রাজ্য। প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছে জমির মালিক কৃষকরা, ভাগচাষী, খেতমজুররা; সোচ্চার হয়েছে এস ইউ সি আই সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, নানা মানবাধিকার সংগঠন এবং এ রাজ্য সহ গোটা দেশের বুদ্ধিজীবীরা। গড়ে উঠেছে কৃষক-খেতমজুরদের সংগ্রাম কমিটি। চলছে মিটিং, মিছিল, অবরোধ, বনধ্-হরতাল। কিন্তু সিঙ্গুরের আন্দোলন শুধু সিঙ্গুরেই সীমাবদ্ধ নয়। সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে এই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হলেও গোটা রাজ্যে প্রায় দু'লক্ষ একর কৃষিজমি থেকে নানা অজুহাতে কৃষকদের উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। শুধু এ রাজ্যেই কেন, গোটা দেশেই আজ শিল্পের নামে কৃষিজমি দখল চলছে অবাধে, চলছে কৃষক উৎখাত। কোথাও সরকার জমির দখল নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে, যেমন এ রাজ্যে টাটাকে দিচ্ছে সিপিএম সরকার, আবার কোথাও শিল্পপতিরা সরকারি সহায়তায় সরাসরি তাদের জমি দিতে বাধ্য করছে কৃষকদের। জমি যেভাবেই নেওয়া হোক না কেন, ফল একই— লক্ষ লক্ষ কৃষক জমিচ্যুত হচ্ছে, জীবিকাচ্যুত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই নির্বিচারে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকেই। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমি দখল করা হচ্ছে জোর করে, প্রশাসনিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। কৃষকদের প্রতিবাদকে রাষ্ট্রশক্তির জোরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে; জমিচ্যুত কৃষকদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা নেই, ব্যবস্থা নেই কর্মসংস্থানেরও। এক কথায় অনিশ্চিত, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের দেশজুড়ে।

শিল্পপতিরা এখন জমির দিকে হাত বাড়াচ্ছে কেন? কারণ গোটা বিশ্বজুড়েই শিল্পপণ্যের বাজারে প্রবল মন্দা চলছে। এমনকী শিল্পোন্নত দেশ বলে পরিচিত ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলিতেও হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। ছাঁটাই হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজোড়া এই সংকটের প্রকোপ থেকে আমাদের দেশও বাদ নেই। কারণ ভারতও একটি পুঁজিবাদী দেশ। এখানেও হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হচ্ছে, উৎপাদিত পণ্যের বাজার নেই। পুঁজিবাদী তীব্র শোষণের ফলে সমাজের ৮৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র অথবা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, শিল্পপণ্য কেনার ক্ষমতা নেই

তাদের। শোষণ যত তীব্র হচ্ছে, শ্রমিক যত ছাঁটাই হচ্ছে, ততই বেড়ে চলেছে এই সংখ্যা। তার ফল হিসাবে উৎপাদন উদ্বৃত্ত হচ্ছে, পরিণতিতে আরও কারখানা বন্ধ হচ্ছে। অলস হয়ে পড়ছে পুঁজি। কিন্তু পুঁজির ধর্মই হচ্ছে সে বসে থাকতে পারে না। তাকে যেখানে হোক বিনিয়োগ করতেই হবে। তাই বৃহৎ পুঁজির মালিকরা হাত বাড়িয়েছে জমির দিকে।

এক্ষেত্রে তাদের দু'টি উদ্দেশ্য কাজ করছে। প্রথমত, কৃষিজমি দখল করে তাকে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় কাজে লাগানো, অর্থাৎ, বৃহৎ আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলে সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অংশের মধ্যে তা বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করা; সমাজের মুষ্টিমেয় ১৫ শতাংশ সচ্ছল মানুষের জন্য বড় বড় বহুতল বাজার (মার্কেট কমপ্লেক্স), মাল্টিপ্লেক্স গড়ে তোলা, তাদের ব্যবহৃত গাড়ি ও ব্যবসায়িক পণ্য চলাচল দ্রুত করার জন্য বহু লেনের এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলা প্রভৃতি। দ্বিতীয় এবং অন্যতম উদ্দেশ্য হল, দেশের মধ্যে বৃহত্তম খাদ্যের বাজারটি দখল করা। সকলেই জানেন, কৃষকরা ফসল উৎপাদন করলেও তার মূল্য নির্ধারণে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারটিকে বৃহৎ ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরাই নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তারা যে দাম নির্ধারণ করে দেয়, সেই দামেই চাষী তার নিজের ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় কৃষিপণ্যের যে দাম ক্ষুদ্র কৃষকরা পায় তাকে কোনমতেই লাভজনক বলা চলে না। অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করে আসছে কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। তাই রাজ্যে রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আত্মহত্যা আজ স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

এবার পুঁজিপতিরা কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ছাড়াও সরাসরি কৃষি উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করে সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন এবং বিপণনের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চলেছে। অর্থাৎ কৃষিপণ্যের ফাটকা ব্যবসা, এতদিন পর্যন্ত যার কোন আইনি স্বীকৃতি ছিল না, আজ সরকারের নয়া আর্থিক নীতি, কৃষিনীতিতে তাকে যেমন একদিকে সরকারি বৈধতা দেওয়া হচ্ছে, তেমনই কৃষি উৎপাদন এবং তার খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের অধিকারও আজ সরকার একচেটে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণটিই এই কৃষি-ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাবে। এখন থেকে পুঁজিপতিরা পুঁজির জোরে তাদের ইচ্ছামতো ফসল কৃষকদের উৎপাদন করতে বাধ্য করবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের বদলে, 'অর্থকরী ফসল', যা বিদেশে রপ্তানি করা যাবে বা এদেশের ধনীরা কিনতে পারবে অথবা কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাজে লাগবে তা-ই উৎপাদনে বাধ্য করবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখা দেবে খাদ্যসংকট এবং খাদ্যশস্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি; কৃষিক্ষেত্রও পরিণত হবে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের উচ্চ মুনাফা লোটার

ক্ষেত্রে। কালক্রমে এক্ষেত্রে বৈদেশিক একচেটে পুঁজি ও মাল্টিন্যাশানালরাও ঢুকবে।

কৃষিতে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ বিশ্বে নতুন ঘটনা নয়। ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার দেশে দেশে বহু আগেই এ জিনিষ ঘটেছে। এইভাবে কৃষকদের বাধ্য করা হয়েছে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অর্থকরী ফসলের নামে টমেটো, কমলালেবু প্রভৃতির চাষ করতে। খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর দেশগুলিতে ধীরে ধীরে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে; আর এই ঘাটতি মেটাতে চড়া দামে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে খাদ্যশস্য। আমাদের দেশেও বৃহৎ পুঁজির মালিক আম্বানিরা ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে কৃষিপণ্যের ব্যবসায়; সরকার সর্বত্রই তাদের জন্য জমি বরাদ্দ করছে। এর ফল হিসাবে কৃষিপণ্য এবং কৃষি সরঞ্জামের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিকেশ হয়ে যাবে এক ধাক্কায়। এমনকী রাজ্যের কয়েক হাজার হিমঘরও চলে আসবে বৃহৎ পুঁজির দখলে।

এ রাজ্যেও শুরু হয়েছে অবাধে জমি দখল। পুঁজির ধর্মই যেহেতু সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, তাই জমি দখলের ক্ষেত্রে কোন বাছবিচারই আজ পুঁজিপতিরা করছে না। একফসলি থেকে বহুফসলি— সব জমিরই দখল নিচ্ছে তারা। তাতে কৃষকরা, যারা যুগ যুগ ধরে জমিতে চাষ করে আসছে, ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে পতিত জমিকে উর্বর করেছে, একফসলি জমিকে বহুফসলিতে পরিণত করেছে, তারা যদি পথের ভিখারিতেও পরিণত হয়, তাতেও কুছ পরোয়া নেই। এই উদ্ধত মনোভাব শুধু সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিদেরই নয়, কেন্দ্র এবং রাজ্যের দক্ষিণ এবং বাম নামধারী সকল সরকারেরই। তাই সিঙ্গুরে কৃষকদের সমস্ত প্রতিবাদ, এমনকী প্রবল জনমত অগ্রাহ্য করে, পুলিশ-র‍্যাফ-কমব্যাট ফোর্স দিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার চালিয়ে চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে টাটার হাতে তুলে দিতে সিপিএম সরকার বদ্ধপরিকর।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের পথ বেয়েই এই নীতি এসেছে। বিশ্বায়নের মূল কথাই হচ্ছে, দেশের শিল্প-কৃষি-পরিষেবা-শিক্ষা— সব ক্ষেত্রই দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অবাধ লুঠের জন্য খুলে দিতে হবে। মুখে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যত কথাই বলুক না কেন, বাস্তবে সিপিএমও আজ বিশ্বায়নের স্রোতেই গা ভাসিয়েছে। পুঁজিবাদী নীতিকে মেনে নিয়ে তাকেই দক্ষতার সাথে কার্যকর করে চলেছে। অন্যান্য রাজ্যেও বিজেপি, কংগ্রেস, জনতা, সমাজবাদী, যে যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে, সব দলের সরকারই উন্নয়নের নামে একই কাজ করে চলেছে। উন্নয়নের এই পুঁজিবাদী মডেল মেনে নিলে এ কাজ করতে বাধ্য। গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক থেকে হরিয়ানা, সারা দেশজুড়েই চলছে কৃষকদের উৎখাত করে জমি দখল। এক্ষেত্রে বুর্জোয়া দলগুলির সাথে সিপিএমের কোনও পার্থক্যই আজ আর নেই। বিশ্বায়নের নীতি মেনে এ রাজ্যেও তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ ঘটাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ ঘটাচ্ছে,

শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ করেছে; পাশাপাশি একের পর এক কালাকানুন জারি করে, অত্যাচার চালিয়ে গণআন্দোলন স্তব্ধ করতে চাইছে। আজ সিপিএম নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য এই পুঁজিবাদী উন্নয়ন — যা আসলে শুধুমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীরই উন্নয়ন এবং শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের সর্বনাশ। সাধারণ মানুষকে জীবিকা থেকে উৎখাত করা, জমি থেকে উৎখাত করা, বাসভূমি থেকে উৎখাত করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত করা প্রভৃতি কার্যকরী করে পুঁজিপতিশ্রেণীকে সন্তুষ্ট করা এবং বিনিময়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার ছাড়পত্র আদায় করা। তাই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করতে পারেন, 'টাটার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না', তার জন্য যদি শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে, এমনকী খুনও করতে হয়, তাতেও তাঁরা আজ আর পিছপা নয়। সিঙ্গুরে প্রতিবাদী কৃষক যুবক রাজকুমার ভুল পুলিশের নির্মম অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছেন। জমিরক্ষা আন্দোলনের কর্মী কিশোরী তাপসী মালিককে সরকারি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে খুন করে মৃতদেহ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাস্তবিক অর্থেই সিপিএম আজ টাটার পাহারাদারে পরিণত হয়েছে। এজন্যই সিপিএম আজ পুঁজিপতিদের এত প্রিয় দল। তাই পুঁজিপতিরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেশের মধ্যে মডেল হিসাবে তুলে ধরছে। তাই শিল্পপতিরা চায় তাদের কারখানায় ইউনিয়নের নেতৃত্বে থাক সিটু। শুধু ভারতের পুঁজিবাদীরাই নয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত, মার্কিন পুঁজিপতিদের মুখেও আজ সিপিএমের প্রশংসা। সি পি এমের এই ভূমিকাই দেশজোড়া শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার পথে আজ প্রধান বাধা। অথচ যত দিন যাচ্ছে পুঁজিবাদী শোষণ ততই অক্টোপাসের মতো শ্রমিক-কৃষককে চেপে ধরছে।

ফলে, সিঙ্গুরে কৃষিজমি দখল থেকে শুরু করে এসবই ঘটছে বিশ্বায়নের অঙ্গ হিসাবে সরকারের নয়া আর্থিক নীতি, কৃষিনীতি অনুযায়ী। নয়ের দশকের গোড়ার দিকে, যখন দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী চরম বাজার সংকট থেকে বেরোনোর আর কোনও উপায়ই পাচ্ছিল না, তখনই শেষ অস্ত্র হিসাবে এবং ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে এই নয়া আর্থিক নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল। এই নীতিরই অঙ্গ হিসাবে ডব্লু টি ও-র সদস্য হওয়া। এই নীতিরই অঙ্গ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের চূড়ামণি মার্কিন সরকারের সাথে দহরম মহরম, এত চুক্তি। ডব্লু টি ও'র শর্ত হিসাবেই পুঁজির এই অবাধ যাতায়াত, কৃষিপণ্য সহ দেশের বাজার বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া। এই নীতি মেনেই জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন তুলে দিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে বিপুল পরিমাণ জমি কুক্ষিগত করার অধিকার তুলে দেওয়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন প্রভৃতি প্রতিটি পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে সরকারি ভরতুকি তুলে নেওয়া, সরকারি প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসঙ্কোচন, বেসরকারিকরণ, শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারগুলি হরণ করা প্রভৃতি। অর্থাৎ জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

যে সংকট দেখা দিচ্ছে, তার মূল উৎস হিসাবে কাজ করছে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রচিত বিশ্বায়নের এই নীতি তথা উন্নয়নের পুঁজিবাদী মডেল। পুঁজিপতিশ্রেণী তীব্র বাজার সংকট থেকে রেহাই পেতেই আজ সিঙ্গুরের কৃষিজমিতে হাত দিয়েছে, আগামীকাল দেবে খড়্গপুরে, হলদিয়ায়, নন্দীগ্রামে, বারুইপুরে, হাওড়ায়, জলপাইগুড়িতে। দখল করবে আরও হাজার হাজার একর জমি। সংকটের মধ্যেও পুঁজিবাদী শোষণকে অব্যাহত রাখার সামগ্রিক পরিকল্পনারই অঙ্গ সিঙ্গুর। তাই সিঙ্গুরের আন্দোলন কোনও বিচ্ছিন্ন আন্দোলন বা শুধু সিঙ্গুরের কৃষকদের আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যে লড়াই চালাচ্ছে, শ্রমিক-কৃষকের উপর নেমে আসা পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বত্র যে লড়াই চলছে, সেই সামগ্রিক আন্দোলনেরই অংশ। কৃষকদের উপর বর্তমান আক্রমণও পুঁজিপতিশ্রেণী, পুঁজিবাদী সরকার ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই হানছে। ফলে কৃষকদের এই আন্দোলনের বর্শামুখকেও রাখতে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। আন্দোলন যদি পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনের পরিপূরক না হয়, তাহলে সমস্ত লড়াই-ই শেষপর্যন্ত ভোটবাক্সে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। এই সত্যটি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজকে উপলব্ধি করতে হবে।

[গণদাবীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ : ৫৯ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ১৯-১২-০৬]

জমি অধিগ্রহণ
পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি মেনেই হচ্ছে

হাজরার জনসভায় কমরেড রণজিৎ ধর

রাজ্যের সর্বত্র শিল্পায়নের নামে কৃষিজমি দখলের প্রতিবাদে ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ কলকাতায় হাজরার যতীন দাস পার্কের সামনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। সভায় সহস্রাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ, প্রবীণ অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি। এছাড়াও ছিলেন এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জী ও কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতবর্ষে জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে, ওড়িশার কলিঙ্গনগরে, পাঞ্জাবের বার্নালাতে, হরিয়ানার কার্নালেও কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে। চাষের জমি অধিগ্রহণ করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার সিপিএম-এর পরিকল্পনা বাধা পাওয়ায় তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানারকম মিথ্যা প্রচার করে চলেছে। সিপিএম নেতারা বলছেন, হাজার হাজার বেকারের কাজের জন্য, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তাঁরা শিল্প করতে চান। আমরা সে ব্যাপারে বাধা দিচ্ছি, আমরা শিল্প চাই না, বেকারদের কর্মসংস্থান হোক চাই না। এইরকম মিথ্যাচার সিপিএম নেতারা আগেও করেছেন। ক্ষমতায় আসার পরই প্রাথমিক স্তরে যখন তারা ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেয় এবং তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন শুরু করি, তখনও একইভাবে তারা মিথ্যা প্রচার করেছিল। তারা বলেছিল — আমরা নাকি মাতৃভাষার বিরোধী। সেদিন জনসাধারণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। ফলে শুরুতে অনেককে তারা বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে অনেক বছর লেগে যায়। আজ তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেকাংশেই নষ্ট হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্টদের মতো বারবার মিথ্যা বলে কিছু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তারা সৃষ্টি করতে পেরেছে। আমরা শিল্প করার বিরুদ্ধে একটি বারও বলছি না। আমরা বলছি, শিল্প হলে অকৃষি জমিতে কর। বুদ্ধদেববাবুরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির পরিমাণ মোট জমির মাত্র ১ শতাংশ, ফলে কৃষিজমি নিতে হবেই। মুখ্যমন্ত্রী যে এক শতাংশের কথা বলছেন, সেটার পরিমাণ কত ? রাজ্যে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ৮৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৪০ হেক্টর, অর্থাৎ ২ কোটি ১৪ লক্ষ একরের কিছু বেশি। এর এক শতাংশ কত ? এর ১ শতাংশ হল ২ লক্ষ ১৪ হাজার একরের বেশি। আবার এই

সরকারের কৃষিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী পতিত জমির পরিমাণ ৪.০৯ শতাংশ, অর্থাৎ ৮ লক্ষ একরের উপর। শিল্পের নামে তারা কত জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করেছে ? ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দেওয়া হিসাব, যা তাঁর কৃষিদপ্তরের সঙ্গেই মিলছে না, তদনুযায়ীও তাঁদের যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি পতিত জমি রয়েছে। তাহলে প্রয়োজনমতো পতিত জমি নেই বলে যেকথা তাঁরা বলছেন, সেটা মিথ্যাচার নয় কি ?

নন্দীগ্রাম সহ রাজ্যে ৮টি স্পেশাল ইকনমিক জোন গঠনের যে উদ্যোগ সিপিএম নিয়েছে, কমরেড রণজিৎ ধর তাকে গরিব বধ করার কসাইখানা হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকার বলছে টাকা নেই, তাই স্বাস্থ্য-শিক্ষা সহ জনসাধারণের নিত্যব্যবহার্য জিনিসে ভর্তুকি তুলে দিচ্ছে, অথচ স্পেশাল ইকনমিক জোন সহ অন্যত্র পুঁজিপতিদের ট্যাক্স-ফ্রি করে দিচ্ছে। প্রায় বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, জল দিচ্ছে, পরিকাঠামো তৈরি করে দিচ্ছে। সেখানে দেশের আইন চলবে না, কোনও দাবি-আন্দোলন চলবে না, মালিক যেমন খুশি নিয়োগ করবে, ছাঁটাই করবে, যেমন খুশি বেতন দেবে — এক কথায় স্পেশাল ইকনমিক জোনগুলি হবে শোষণের স্পেশাল ক্ষেত্র — যা মেনে নেওয়া যায় না।

কেন দেশজুড়ে এই জমি অধিগ্রহণ ? তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড রণজিৎ ধর দেখান, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নিয়মে উৎপাদন হয়, অর্থাৎ এখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন। বুদ্ধদেববাবুরাও বলছেন, টাটারা এখানে কারখানা করতে আসছে মুনাফার জন্য। এখানে ক্রেতারা যদি মালিকের নির্ধারিত মুনাফা দিয়ে জিনিস ক্রয় করতে পারে, তবেই সে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে, না হলে নয়। এই মুনাফা আসছে মজুরকে-চাষীকে ন্যায্য পাওনা না দিয়ে, ঠকিয়ে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে। আর যত ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকে,তত কলকারখানা বন্ধ হতে থাকে, ছাঁটাই বাড়তে থাকে। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও কমে যায়, সঙ্কট আরও বাড়ে। এই ব্যবস্থায় একদিকে মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে জমে পুঁজির পাহাড়, অন্যদিকে বিশাল জনসমষ্টি নিঃস্ব হয়ে যায়।

এই যে টাটা ব্রিটিশ কোম্পানি 'কোরাস' কিনল — এত পুঁজির অধিকারী সে হল কীভাবে ? বিশ্বে প্রথম দশ ধনী ব্যক্তির মধ্যে ভারতবর্ষও আজ জায়গা করেছে। এত পুঁজির অধিকারী তারা হল কী করে ? হল দেশের মানুষকে শোষণ করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্যই, যেটা দেশে পুঁজিপতিরা স্বাধীনতার পর কংগ্রেসকে ক্ষমতায় রেখে চালু করে, তার পরিণামেই আজ শিল্পে মন্দা। এই মন্দা আজ বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে। তিনি বলেন, বিপুল পুঁজি সত্ত্বেও মানুষের ক্রয়ক্ষমতার

অভাবের কারণেই শিল্পপণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতিরা আজ আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ফলে এই পুঁজি যাচ্ছে ঋণপত্র, বন্ড ইত্যাদি কেনাবেচায়, ব্যাঙ্কে, বীমায় ; যাচ্ছে শেয়ারবাজারে, খাটছে পরিষেবা ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবসায়। এই পুঁজি আমাদের দেশে কৃষিতে ঢুকেছে অনেক আগে থেকেই। এখন তা বাড়ছে।

সিপিএম এখন আম্বানিদের কৃষিজাত ফসল ও কৃষিপণ্য ব্যবসায় ঢুকতে দিচ্ছে। এর ফলে কৃষিকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ব্যবসা বিপন্ন হয়ে পড়বে, হাজারে হাজারে কৃষিজাত পণ্যের দোকানদার সর্বস্বান্ত হবে। বৃহৎ পুঁজির নিয়মই হচ্ছে, ক্ষুদ্র পুঁজিকে গিলে খাওয়া। একসময় বৃহৎ পুঁজির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বহু ক্ষুদ্র শিল্পে সংরক্ষণ চালু ছিল, আজ সরকার বৃহৎ শিল্পপতিদের চাপে তা তুলে দিয়েছে।

কৃষিতে পুঁজি ঢোকার রাস্তা করে দিতে সিপিএম নেতৃত্ব বলছে, চাষ এখন অলাভজনক হয়ে পড়েছে ; চাষের খরচ বাড়ছে, ফসল বিক্রি করে খরচের দামই উঠছে না। ফলে তাঁরা চাষীকে চাষ ছেড়ে দিতে উপদেশ দিচ্ছেন। কমরেড রণজিৎ ধর প্রশ্ন তোলেন, চাষীর এই অবস্থার জন্য দায়ী কে ? কৃষিতে সরকার ভর্তুকি তুলে দিল কেন ? চাষীর কাছ থেকে ন্যায্য দামে ফসল কেনার ব্যবস্থা করল না কেন ? বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ঠকানোর হাত থেকে চাষীদের বাঁচাল না কেন ? কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, ১৯৬৬-৬৭ সালেই খাদ্য আন্দোলনের সময় আমাদের দল খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের দাবি তুলেছিল। অন্য বামপন্থী দলগুলো তা মানতে চায়নি। তারা পাইকারি স্তর পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য মেনেছিল। আন্দোলনের চাপে কংগ্রেস সরকার একসময় পাইকারি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করতেও বাধ্য হয়েছিল। সিপিএম সরকার তাও করেনি। তারা পুরোপুরি বড় বড় মজুতদার, ব্যবসায়ীদের হাতে চাষীদের সর্বস্বান্ত হওয়ার পাকা ব্যবস্থা করেছে। এখন তারা পুঁজিপতিদের জন্য চাষীর জমি জোর করে কেড়ে নিচ্ছে।

সিপিএম বলছে, পশ্চিমবঙ্গ নাকি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কৃষির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। কৃষির এই উন্নত ভিত্তির উপরই নাকি শিল্প গড়ে উঠবে। তাদের এ'কথা কি সত্য ? এ'কথার মানে কি চাষীর হাতে অনেক টাকা হয়েছে ? চাষী দুধেভাতে আছে ? ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের রিপোর্ট বলছে, গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের দৈনিক পারিবারিক ব্যয় ১২ টাকা, শহরে ১৯ টাকা। এই টাকায় সংসার চলে ? বুদ্ধদেববাবুরা কী এসবের খবর রাখেন ? পশ্চিমবঙ্গ নারীপাচারে দ্বিতীয়। এই নারীরা কাদের মা-বোন, কী অবস্থায় পড়লে বাবা তার মেয়েকে বেচে দেয়, বুদ্ধদেববাবুরা তার খবর রাখেন ? তাঁরা আজ জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, সঙ্কট শুধু চাষীদের ক্ষেত্রেই নয়, যারা কর্মচারী, যারা

শ্রমিক, তাদেরও মাথায় ছাঁটাইয়ের খড়্গ ঝুলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ — জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঙ্কট। জনগণের উপর সবদিক থেকে এই যে আক্রমণ, তার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদ। এই যে কৃষিজমি অধিগ্রহণ হচ্ছে— তাও হচ্ছে বিশ্বায়নের নীতি মেনে। এ'কথা আমাদের দল ছাড়া অন্যান্য দল বলছে না। পুঁজিবাদই যে শত্রু এ'কথা অন্য কেউ বলছে না। তিনি বলেন, এদেশে আন্দোলন বহু হয়েছে, মানুষ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছে। '৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গকে অনেকাংশে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। আজ পশ্চিমবঙ্গ আবার জেগে উঠেছে। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আন্দোলনে অনেকেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু কোন্ নেতৃত্ব, কোন্ রাজনীতি, কে সঠিক তা জনগণকে বিচার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজকের আন্দোলন পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক না হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, এ লড়াই হবে দীর্ঘস্থায়ী। এর জন্য সর্বত্র চাই গণকমিটি। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে বলেন, আপনারা বিচ্ছিন্ন না থেকে এলাকায় এলাকায় সংগঠিত হোন, গণকমিটি গড়ুন। আপনারা সকলের বক্তব্য শুনুন, বিচার করুন, সিদ্ধান্ত নিন। অন্ধের মতো কোনও নাম-ডাকওয়ালা লোকের পিছনে ছুটলে আবারও ঠকবেন। কারণ নেতা বানায় কাগজ, প্রচারমাধ্যম ; আর সেগুলো চালায় পুঁজিপতিরা।

দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে সিপিএমকে কাজ করতে দেখে মার্কসবাদকে ভুল বুঝবেন না

মেদিনীপুরের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

পশ্চিমবাংলায় কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে, আপনারা যারা গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে নানা সংগ্রামী কর্মসূচি সফল করেছেন তাঁদের এবং এই জেলার জনগণকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি সিপিএমের সেই সৎ কর্মী-সমর্থকদের, যাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন করে যাচ্ছেন। আপনারা লক্ষ করছেন, নন্দীগ্রামে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে সিপিএম সরকার খানিকটা পিছু হঠেছে। প্রথম দিকে তারা ভেবেছিল, যেহেতু তারা পশ্চিমবঙ্গের গদিতে, তাদের বিস্তর এমএলএ-এমপি, অসংখ্য পঞ্চায়েত আছে, পুলিশ-প্রশাসন তাদের হাতে, অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম তাদের জয়গান গাইছে, এবং দেশি একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি তাদের খুঁটি, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার তাদের বন্ধু, পুলিশের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত ক্রিমিনাল বাহিনীকে তারা কন্ট্রোল করছে; অতএব এই শক্তির জোরে তারা ইচ্ছামতো জমি দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু নন্দীগ্রামে জনগণ প্রবল প্রতিরোধ করে জানিয়ে দিল যে, মানুষকে যতটা দুর্বল এবং যতটা মেরুদণ্ডহীন করতে পেরেছে বলে তারা ভেবেছিল, ততটা পারেনি। তার ফলে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে যে, 'আমরা ভুল করেছি', যদিও এই কথাটাও একটা চালাকি মাত্র। জনগণের প্রবল বিরুদ্ধতা, নিচুতলার কর্মীদের আপত্তি, এরাজ্যে ও বাইরে সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন তারা। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের পক্ষে সমগ্র রাজ্যের জনগণ, শ্রমিক-চাষী-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলা সকলেই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন, যা এর আগে এতটা দেখা যায়নি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারটি বাংলা বন্ধ হয়ে গেল। ফলে সিপিএম চাইছে সময় নিয়ে একে খানিকটা স্তিমিত করে দিতে, জনগণের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভ্রান্তি আনতে। তারপর তারা তাদের ষড়যন্ত্র হাসিল করবে।

সিপিএম নেতারা রাজ্যের জনগণকে প্রতিদিনই বলছেন, তাঁরা শিল্পায়ন চান, উন্নয়ন চান, তাঁরা বেকারদের কর্মসংস্থান চান। তাঁরা বলছেন, আমরা যাঁরা আন্দোলন করছি, আমরা হচ্ছি উন্নয়নবিরোধী, শিল্পায়নবিরোধী ; বেকারদের কর্মসংস্থান হোক

আমরা চাই না। একথা কি ঠিক? যদি প্রকৃত শিল্পায়ন হত, অবশ্যই আমরা সমর্থন করতাম। আমরা বারবার জনগণকে বলেছি, শিল্পায়নের নামে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া হচ্ছে। দু-চারটি কলকারখানা করা মানেই শিল্পায়ন নয়। শিল্পায়ন কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। শিল্পায়ন ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে। আজকের যুগে এটা কি কোথাও ঘটছে? কোথাও কি এটা ঘটা সম্ভব? মাঝে মাঝে ২/৪টা কারখানা যা হচ্ছে তাও হচ্ছে পুঁজি বা প্রযুক্তিনির্ভর, অর্থাৎ স্বল্প মজুর নিয়ে উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প। উৎপাদন বাড়লেও চাকরি হচ্ছে না, ওদের কথায় 'জবলেস্ গ্রোথ'।

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেখালেন, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। উন্নত দেশগুলিতে পুঁজিবাদ অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ পার হয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে প্রবেশ করেছে। এখন এইসব দেশের বাজারের উপর সম্পূর্ণ কব্জা কায়েম করেছে সেখানকার মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী। দেশের মানুষকে শোষণ করে করে এরা দেশের ভিতরের বাজারকে এমনভাবে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে যে, স্বদেশে বিনিয়োগ করলে তাদের মুনাফার স্বার্থ পূরণ হবে না। এই স্তরে ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্পপুঁজির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে লগ্নিপুঁজির জন্ম দেওয়া হয়েছে, যা বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। এ যুগে পুঁজিবাদ আর কৃষির বিকাশ ঘটাতে পারে না, শিল্পায়ন করতে পারে না, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারে না। কারণ এ যুগের পুঁজিবাদ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ। এ যুগে বরং অবাধ শিল্পায়নের পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যুগে সর্বহারা বিপ্লবের দ্বারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে না ভাঙতে পারলে শিল্পায়ন আর সম্ভব নয়। সিপিএম নিজেদের মার্কসবাদী বলে, অথচ সাম্রাজ্যবাদের যুগে দাঁড়িয়ে তারা বলছে, শিল্পায়ন করবে। কার ব্যাখ্যা মার্কসবাদসম্মত — লেনিনের, না সিপিএমের?

বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাকে বলা হয় বিশ্বের অর্থনীতির লোকোমোটিভ অর্থাৎ ইঞ্জিন। সেই আমেরিকার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পর্যন্ত বলছেন, মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। শুধু আমেরিকা নয়, ইউরোপের অর্থনীতিতে, বা প্রায় সকল পুঁজিবাদী দেশেই এখন মন্দা চলছে। মাঝেমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনিয়োগের যে বিপুল বৃদ্ধি দেখা যায় সেটা আসলে বুদবুদ, অর্থাৎ বাজারে প্রকৃত চাহিদার সাথে এর সম্পর্ক নেই। জুয়া বা ফাটকার মতো লাভের আশায় এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে, শেয়ারের দাম বাড়ছে, তারপর একটা সময় ফুলে-ওঠা বাজার ফেটে যাচ্ছে, যেমন বুদবুদ খানিকটা ফুলে উঠে ফেটে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল অঞ্চল জুড়ে কলকারখানা আজ বন্ধ। প্রতি মাসে সেখানে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। তিন কোটির মত মানুষ ফুটপাতে

থাকে। একই সঙ্কট ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, জাপানে, সমস্ত জায়গায়। সেইসব দেশে এখন শিল্পায়নের কথা বললে লোক হাসবে।

আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই রাজ্যে ৫৬ হাজারের ওপর কলকারখানা বন্ধ, ১৭ লক্ষের ওপর শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেছে। প্রায় ১ কোটি নথিভুক্ত বেকার চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা নতুন শব্দ এসেছে সিক ইন্ড্রাস্ট্রি, মানে শিল্পেরও রোগ হচ্ছে, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ। প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। এই সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এটা কি অগ্রগতির লক্ষণ ? এটা কি শিল্পায়নের চিত্র ? ন্যাশনাল লেবার সার্ভে'র ২০০৩ সালের রিপোর্ট বলছে, ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাজ পেয়েছে ১৬,০২৯ জন, আর কাজ হারিয়েছে ৩,৮৯,০৮৬ জন। ২০০৩ সালে কাজ পেয়েছে ৯,১২০ জন, আর কাজ হারিয়েছে ৬,৪৫,০০০ জন। এই হচ্ছে খোদ সরকারি রিপোর্ট। এই সংখ্যা আরও বাড়ছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের সরকারি দল সিপিএমের নেতারা আমাদের বোকা মনে করে ভেবেছিলেন, 'শিল্পায়ন' 'শিল্পায়ন' বললেই আমরা বুঝি হাততালি দেব। এটা আমরা পারিনি।

আজকে বিশ্বের প্রায় সব দেশে এবং আমাদের দেশেও পুঁজিবাদী অর্থনীতি, অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি কায়েম রয়েছে। পুঁজিবাদ সমাজের কথা ভাবে না, মানুষের কথা ভাবে না। তার একমাত্র স্বার্থ মুনাফা। বহুদিন আগেই মহান কার্ল মার্কস দেখিয়ে গেছেন, কোথাও কোন মালিক লাভ করতে পারে না শ্রমিককে শোষণ না করে, জনগণকে শোষণ না করে। পুঁজিপতিদের ক্রমাগত মুনাফা বাড়ানো চাই, নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশানে টিকতে হলে সর্বোচ্চ মুনাফা চাই। সেজন্য তাদের দরকার পণ্য বিক্রির বাজার। ওরা যে দামে পণ্য বিক্রি করবে সেই দামে কেনার মত খদ্দেরই হচ্ছে ওদের বাজার, জনগণের প্রয়োজনে বাজার নয়। এই বাজার না পেলে, বাজার ক্রমাগত না বাড়লে পুঁজি অলস হয়ে পড়ে। অথচ পুঁজিবাদ নিজেই শ্রমজীবী জনগণকে ক্রমাগত শোষণ করে করে তাদের ক্রয়ক্ষমতাকে নিঃশেষ করে দিয়ে বাজার সঙ্কুচিত করে। যন্ত্র চালাতে যেমন কয়লা পুড়িয়ে ছাই করা হয়, পুঁজিবাদের মুনাফার মেশিন তেমনভাবে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-মাংস-হাড় সব গুঁড়িয়ে দেয়। এর ফলে বাজারের সঙ্কোচন হয় — বাজার সঙ্কট, অর্থাৎ চাহিদার সঙ্কট তৈরি হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। শিল্পায়ন মানে হচ্ছে — ক্রমাগত বাজার বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাগাতার শিল্প হচ্ছে। এটা আজকের দিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বাজারসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে, বাজারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে ইতিপূর্বে দু'দুটি

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। গ্রাম-শহর-সমাজ-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে। এখনও ইরাকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলছে। সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে পরিচালিত পুঁজিবাদের কাছে মানুষের জীবনের মূল্য, সমাজ-সভ্যতার মূল্য কানাকড়িও নেই। এই দেখুন, বেশ কিছুদিন ধরে বৈজ্ঞানিকরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সতর্কবার্তা দিয়ে যাচ্ছেন। বারবার তাঁরা বলছেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাস সৃষ্টি করে পুঁজিপতিরা মানবজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা কর্ণপাত করছে না। অতি সম্প্রতি বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলন আবারও গভীর উদ্বেগে বলে গেল, এই গ্রীণহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় হবে। বলছে, ইতিমধ্যেই মেরু অঞ্চলের হিমবাহ বা গ্লেসিয়ার গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে সুন্দরবন সহ বিশ্বের বেশ কিছু এলাকা ডুবে যাবে; বিশ্বে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প, মরুভূমি, মারণব্যাধি ভয়ঙ্কর বিপদ সৃষ্টি করবে। তা সত্ত্বেও এজন্য সবচেয়ে বেশি যে দায়ী সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে, তারা গ্রীনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করবে না, কারণ তাতে তাদের শিল্পের সঙ্কট, অর্থাৎ মুনাফার সঙ্কট হবে। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী ভয়ঙ্কর রূপ।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বহুকাল আগেই আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজি ও লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছেছে। সিপিএম, সিপিআই তাদের জনগণতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন অনুযায়ী যখন জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীকে তাদের 'বিপ্লবের মিত্র' হিসাবে গণ্য করছে, জাতীয় বুর্জোয়াদের 'প্রগতিশীল' বলছে, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্য অর্জন করার মধ্য দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে। আমরা জানি, ভারতের একচেটে পুঁজিপতিরা অনেকদিন ধরেই অনুন্নত দেশগুলিতে লগ্নিপুঁজি বিনিয়োগ করছিল। আর এখন শিল্পোন্নত দেশগুলিতে গিয়ে তারা কারখানা কিনছে, বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে ভারতীয় পুঁজির আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিশ্বের বাজারে জায়গা করার জন্যই ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের শরিক হয়েছে। 'খুবই গরিব' যে টাটা কোম্পানিকে সিপিএম সরকারি কোষাগার থেকে জনগণের ১৪০ কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে সিঙ্গুরে জমি দিচ্ছে, সেই টাটাই ডাচ ইস্পাত কোম্পানি 'কোরাস' কিনে নিল ৫৫ হাজার কোটি টাকা দিয়ে। বিড়লা আমেরিকাতে

কিনছে 'নভেলিস্' নামের একটা অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, দাম দিচ্ছে ২৬ হাজার কোটি টাকা। টাটা-বিড়লা আম্বানি ছাড়াও অন্যান্য একচেটিয়া পুঁজিপতিরাও এখন বিদেশে নানা কারখানা কিনছে। এরা এই বিশাল পরিমাণ পুঁজির মালিক হয়েছে আমাদের দেশের জনগণকে শোষণ করে, পথের ভিখারি বানিয়েই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই, '৬০ এর দশকে যাঁরা সিপিএমে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের নিশ্চয় স্মরণে আছে, সেসময় সিপিএম নেতৃত্ব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের যে তত্ত্ব নিয়ে বাজার গরম করেছিলেন সেই তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁদের বিপ্লবের সামনে মূল শত্রু হচ্ছে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ, দেশিয় একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্র; আর তাঁদের মিত্র বা বিপ্লবী শক্তি হচ্ছে, শ্রমিক-কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। এখন দেখা যাচ্ছে, এই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ ও দেশিয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থেই সিপিএম কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে। অর্থাৎ বাস্তবে তাদের মিত্র দাঁড়িয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি, আর শত্রু হচ্ছে কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ। কমরেড শিবদাস ঘোষ সেদিন দেখিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে জাতীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী, খেতমজুর, গরিব কৃষক ও মধ্যবিত্তকে নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। সিপিএম নেতৃত্বের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগানের আসল চরিত্র উন্মোচন করে তিনি এও দেখান যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের পরিণামে সিপিএম আসলে বিপ্লবের বুলি আওড়াতে আওড়াতেই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে বোঝাপড়া করে গদিসর্বস্ব রাজনীতির দিকে যাচ্ছে। আজ সেটাই বাস্তবে নগ্নভাবে দেখা যাচ্ছে।

ওরা বলছে, উন্নয়ন করছে। কী সেই উন্নয়ন? আমাদের দেশ শ্রেণীবিভক্ত। একদিকে শ্রমিক-খেতমজুর-গরিবচাষী-মধ্যবিত্ত জনগণ; আরেকদিকে আছে পুঁজিপতিশ্রেণী ও ধনীসম্প্রদায়। তারা কার উন্নয়নের কথা বলছে? যদি তারা বলে পুঁজিপতিদের উন্নয়ন, তাহলে তাদের কথা ঠিক। খবরের কাগজ খুলুন। কোন্ কোম্পানি কত শতাংশ মুনাফা বাড়িয়েছে, প্রতিদিনই এ খবর পাবেন আপনারা। এদের উন্নয়ন হচ্ছে। আর অন্যদিকে তাকিয়ে দেখুন, জনগণের অবস্থা কী? আমাদের কথা নয়, জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য বলছি। ২০০৪-০৫ সালের সময়কালে দেশে মানুষের ব্যয়ের মাত্রা ও ধরনের উপর সমীক্ষা করে তারা দেখিয়েছে যে, ভারতের গ্রামীণ জনগণের ৩৩ শতাংশের জীবনধারণের জন্য দৈনিক ১২ টাকার বেশি খরচ করার সামর্থ্য নেই। শহরের ক্ষেত্রে এটা দৈনিক ১৯ টাকা। এ টাকায় একটা সংসার চলে? চলতে পারে? অন্যদিকে জিনিষপত্রের দাম তো এবেলা-ওবেলা বাড়ছে। কীভাবে সংসার চলবে? এমনকী যাদের রোজগার দৈনিক ৪০/৫০ টাকা, তাদেরও কি সংসার চলে !

গোটা দেশের চিত্র কী? দেশে আজ কোটি কোটি বেকার ও কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী বেড়েই চলেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে। উত্তর ভারতে প্রবল শীতে কত গরিব মারা যাচ্ছে, এক খণ্ড শীতবস্ত্র কিনতে পারেনি। এই হচ্ছে দেশের চেহারা। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন শহরে ছুটছে, অন্য রাজ্যে ছুটছে। গ্রামে কোনও কাজ নেই। কোথায় যাচ্ছে জানে না, শুধু এইটুকু জানে, গ্রামে থাকার উপায় নেই। অনেকে সপরিবারে চলে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাতে থাকে, ঝুপড়ি করে থাকে। লক্ষ লক্ষ ঘরের মেয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই পশ্চিমবাংলা থেকে সবচেয়ে বেশি মেয়ে বিক্রি হচ্ছে। আট-ন' বছরের মেয়েরা পর্যন্ত পাচার হয়ে যাচ্ছে, কিনছে পশুরা। ভারতবর্ষে নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গ এখন শীর্ষস্থানে। সিপিএম সরকার এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। সিপিএম বলছে, কংগ্রেস বলছে, বিজেপি যখন সরকারে ছিল সেও বলেছে, উন্নয়ন হচ্ছে। এই তো উন্নয়নের চেহারা! উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় শিশুদের কঙ্কাল বেরোল, তাদের মায়েরা ওখানে গিয়েছিল বাড়ি বাড়ি কাজ করতে। এই পশ্চিমবাংলার মায়েরাও ছিল। তাদের শিশুদের কঙ্কাল পাওয়া গেল। এ তো ভয়ঙ্কর চিত্র! এর নাম উন্নয়ন? এই উন্নয়নকে আমরা সমর্থন করতে পারি না বলে আমাদের প্রতি শাসক দলগুলো ক্ষিপ্ত!

আসলে ওরা শিল্পায়নের নামে যে লক্ষ লক্ষ একর জমি নিচ্ছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মূলত উপনগরী তৈরি করা। নতুন নতুন শহর করবে, প্রোমোটারি ব্যবসা করবে, লোকদেখানো ২/৪টা শিল্পও করবে। আমেরিকা প্রথম এ রাস্তা দেখিয়েছে। আমেরিকায় যখন শিল্পে সঙ্কট, পুঁজিপতিরা যখন কারখানায় পুঁজি নিয়োগ করতে পারছে না, বাড়তি পুঁজি অলস হয়ে যাচ্ছে, তখন সেখানকার শিল্পপতিরা আবাসন ব্যবসায় (রিয়েল এস্টেট) নামল — বাড়ি তৈরি কর, বিক্রি কর। ক্রেতাদের টাকা জোগাল ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের হাতেও এখন প্রচুর টাকা, কারণ শিল্পে বিনিয়োগ হচ্ছে না। দেদার বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। কারণ, আমেরিকাতেও সাধারণ মানুষের বাসস্থানের সমস্যা প্রবল। কিন্তু ধারের টাকা ব্যাঙ্ক ফেরত চাইতেই সমস্যা দেখা দিল। বাড়ির মালিকদের অত টাকা নেই, আবার ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা বাড়ি বিক্রি করাও সমস্যা, খদ্দেরও নেই। এই ঘটনার ফলে আমেরিকার জিডিপি, অর্থাৎ ডলার মূল্যে বার্ষিক মোট উৎপাদন পড়ে গেল। গত বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার জিডিপি বেড়েছিল ৬.৫ শতাংশ, আর আট মাস পর নভেম্বর-ডিসেম্বরে জিডিপি নেমে এল ১.৫ শতাংশে। আবাসন ব্যবসার বুদবুদ ফেটে গেছে।

সেই প্রমোটারি, হাউজিং বিজনেস বা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করার জন্যই শিল্পপতিদের এ রাজ্যে জমি চাই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বা পশ্চিম মেদিনীপুরে নয়,

উপনগরী করতে হলে, বাড়ির ব্যবসা করতে হলে কলকাতার আশেপাশে জমি দরকার। কলকাতার আশেপাশে উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এগুলি উর্বর কৃষি এলাকা। এই কৃষিজমিতে ওরা হাত দিচ্ছে। এখানে ওরা হংকং-সিঙ্গাপুরের মতো শহর বানাতে চাইছে যেখানে বিরাট বিরাট ফ্লাইওভার, রাস্তা হবে, অতি অল্পসময়ে ধনীরা বিমানবন্দরে যেতে পারবে। রায়চক থেকে একেবারে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত আট লেনের রাস্তা হবে। বিদেশি সব ব্যবসায়ীরা, তাদের আমলারা, ম্যানেজাররা এখান দিয়ে যাতায়াত করবে। তাদের জন্য এসব রাস্তা দরকার। তারা মাঝে মাঝে এখানে থাকবে। এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা, বড়লোকরা, এরকম প্রত্যেক শহরে একাধিক বাড়ি রাখে। এখানে দু'দিন, ওখানে পাঁচদিন থাকে। এই উপনগরীতে থাকবে দামী দামী হোটেল, মনোরম পার্ক, শপিং মল, রিসর্ট, নাইট ক্লাব, সুইমিং পুল, গল্ফ খেলার মাঠ, দামী মদের বার, নিয়মিত নারী সাপ্লাই, ভোগবিলাসের আরও নানা ব্যবস্থা। এই হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা।

এস ই জেড বলে যেটা নন্দীগ্রামে করতে যাচ্ছিল, সেটাও একটা ভয়ঙ্কর স্কীম। বিশাল এলাকার কৃষকদের জমি-ঘর কেড়ে নেওয়া হবে, কৃষিজমি-স্কুল ধ্বংস করা হবে। হাজার হাজার কৃষক পরিবার পথের ভিখারি হয়ে যাবে। আবার এই এস ই জেডে যারা ব্যবসা করতে আসবে তাদের কোন ট্যাক্স দিতে হবে না, এরা হবে সবরকম ট্যাক্সমুক্ত। রাজ্য সরকার এদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে, জল দেবে। আম্বানি, টাটা, সালিম যারা মিনিটে মিনিটে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা। একদিকে ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা নিয়ে বাজেট ঘাটতির কথা বলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সব কল্যাণমূলক খাতে বাজেট কমাচ্ছে, অন্যদিকে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দু-হাতে ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে, যার ফলে আরও ঘাটতি বাড়ছে।

অন্যদিকে এস ই জেডের মধ্যে যারা কারখানা বা ব্যবসাকেন্দ্র করবে তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের ইচ্ছামতো মজুরি দিতে পারবে, যত ঘণ্টা খুশি কাজ করাতে পারবে, যখনতখন ছাঁটাই করতে পারবে। শ্রমিকরা তাদের সমস্যা নিয়ে কোথাও অভিযোগ জানাতে পারবে না, দেশের শ্রমআইন এখানে প্রয়োগ হবে না। এই হচ্ছে আইনি বন্দোবস্ত। যেজন্য আমরা বলছি, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে বিশেষ কসাইখানা যেখানে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের জবাই করা হবে। দেশের আইন এখানে প্রযোজ্য হবে না। যে কারণে বলা হচ্ছে, দেশের মধ্যে আরেকটা দেশ।

সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি সকলেই এস ই জেড স্কীম চালু করতে তৎপর। যে রাজ্যে যে দল সরকার চালাচ্ছে সেখানেই এরা কৃষিজমি-বাস্তুজমি দখল করে পুঁজিপতিদের হাতে, সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এদের সরকারগুলো হচ্ছে

একচেটে পুঁজিপতিদের 'পলিটিক্যাল ম্যানেজার'। কারখানা চালানোর জন্য যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজার লাগে, ব্যবসা চালানোর জন্য বিজনেস ম্যানেজার লাগে, তেমনই তাদের হয়ে সরকার চালানো, তাদের স্বার্থেই আইন কানুন করা, এসবের জন্য পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে তারা নিয়োগ করেছে এই দলগুলোকে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম সকলে একই পথের পথিক। ফলে সরকারের মাধ্যমে আক্রমণটা এলেও মূল আক্রমণটা চালাচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। তাই এখানে লড়াইও হবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।

সিপিএম কাজ করছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের হয়ে। কেন করছে? ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএম বারবার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। তারা চায় আরও বারবার আসতে। তারা চায় কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের ক্ষমতা আরও বাড়াতে। তার জন্য প্রয়োজন — টাটা, বিড়লা, জিন্দাল, আম্বানিদের আশীর্বাদ, বিদেশি পুঁজির ব্যাকিং। কেননা, এরাই ঠিক করে কে গদিতে বসবে। ইলেকশনে এরাই কোটি কোটি টাকা ঢালে। সংবাদপত্রগুলি কে কন্ট্রোল করে? মালিকরাই করে। টিভি চ্যানেলগুলো মালিকরাই কন্ট্রোল করে। সংবাদপত্র-টিভি ইলেকশানে এইসব দলগুলির পক্ষে কাজ করে। বহুদিন আগে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন — এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি, তাও জনাকয়েক ব্যবসাদারের হাতে। বণিকবৃত্তিই এখন মুখ্যত রাজনীতি। পুঁজিপতিদের শোষণের জন্যই শাসন। শরৎচন্দ্র মার্কসবাদী ছিলেন না। কিন্তু সত্যটা উপলব্ধি করেছিলেন। এখানে গণতন্ত্র, সর্বজনীন ভোট, গভর্নমেন্ট বাই দি পিপ্‌ল, অফ দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল — এই সব কথাগুলো শুধু বইয়ের পাতায় আছে। বাস্তবে এখানে হল বাই, ফর ও অফ দি ক্যাপিট্যালিস্ট। তারাই সব কিছু ঠিক করছে। এ সত্য যতদিন আমরা না বুঝব, বারবার আমরা ঠকব।

একটা রাজনৈতিক দল, একটা নেতৃত্ব কোন্ শ্রেণীর হয়ে কাজ করছে তা বুঝতে হবে। একথা বারবার আমাদের মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ তুলে ধরেছিলেন। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। সিপিএম যেহেতু মার্কসবাদের আলখাল্লা পরে বেড়ায়, দলের নামের পাশে 'মার্কসবাদী' লেখা থাকে, এটা দেখে আপনারা যদি ভুল বুঝে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করেন তবে সর্বনাশ হবে। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদের যে ধারা ক্ষুদিরামকে দিয়ে শুরু হয়েছিল তারই সার্থক প্রতিনিধি ছিলেন নেতাজী। সশস্ত্র মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরেন তিনি। এই নেতাজীর বিরুদ্ধে সেসময় টাটা-বিড়লার প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব। এই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ষড়যন্ত্র করে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। পরে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য

করা হয়, শেষপর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত হয়ে তিনি রামগড়ে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বামপন্থীদের একটা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে তিনি খুব আশা নিয়ে সিপিআই-এর সহযোগিতা চেয়েছিলেন। কিন্তু বারবারই সিপিআই তাকে বিমুখ করেছিল। অথচ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন ১৯২৫ সালে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কর্তব্য হবে, আপসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে পেটি-বুর্জোয়া, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের সাথে সহযোগিতা করা। কিন্তু সিপিআই তা করেনি। সিপিআই-এর এইসব ভূমিকা দেখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে যারা কমিউনিস্ট বলে পরিচিত, তাদের দেখে মনে হয় না তারা দেশপ্রেমিক। তারপরে বললেন, আমি মার্কস-লেনিনের বই পড়েছি, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ডকুমেন্ট পড়েছি। তাতে বুঝেছি, যারা যথার্থ কমিউনিস্ট তারা খাঁটি দেশপ্রেমিক। এই ঘটনাটা এজন্য বললাম যে, সিপিআই-এর এইসব বিশ্বাসঘাতকতা দেখেও নেতাজী কিন্তু কমিউনিজম, মার্কসবাদ এবং সোভিয়েট নেতৃত্বকে ভুল বোঝেননি। তিনি বলেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান মার্কসবাদ। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সোভিয়েট রাষ্ট্র, সর্বহারা সংস্কৃতি। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, কমিউনিজমের মতো সর্বজনীন আদর্শ ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না এইজন্য যে, এদেশে কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচিত, তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, কার্যকলাপ মানুষকে কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়। নেতাজী মার্কসবাদী না হয়েও মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী হিসাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের অপরিহার্য গুরুত্ব বুঝেছিলেন।

এই সুভাষচন্দ্রই সিঙ্গাপুর থেকে শেষ রেডিও ভাষণে বলেছিলেন, এখনও স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, আগামী কয়েক যুগ বিশ্ব তাঁর উপরই নির্ভর করবে। এও আপনারা জানেন, শেষের দিকে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় যাওয়ারই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। ইতিহাসের এই অধ্যায়টা আমি বলছি এইজন্যই যে, নেতাজীর মতো মানুষ যাঁকে সিপিআই ফ্যাসিস্ট জাপানের দালাল পর্যন্ত বলেছিল, তিনি কিন্তু সিপিআইকে দেখে সাম্যবাদের আদর্শকে, মার্ক্সবাদকে ভুল বোঝেননি, তার বিরুদ্ধতা করেননি। আপনারা জানেন, এই সিপিআই '৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিল — যার জন্য ১৯৫১ সালে মস্কোয় স্ট্যালিনের সাথে সিপিআই নেতারা দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন বলে সেই যুগের সিপিআই নেতা ডঃ রণেন সেন লিখেছেন। এরা মুসলিম লিগের সাথে কণ্ঠ

মিলিয়ে দেশ বিভাগকেও সমর্থন করেছিল। এই হচ্ছে এদেশে অবিভক্ত সিপিআই নেতাদের ইতিহাস। সিপিআই-এর এসব ভূমিকা দেখে ও এই ধরনের ভুলের কারণ কী তা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে হাতিয়ার করে বিচার করে, কমরেড শিবদাস ঘোষ এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, এই দলটি আদৌ মার্কসবাদী নয়। এদের জীবনদর্শন, বিচারধারা, দলের গঠনপদ্ধতি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, তাদের সংস্কৃতি, আন্দোলন পদ্ধতি — কোনটাই মার্কসবাদসম্মত নয়। এজন্যই তিনি '৪০-এর দশকে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার সঙ্কল্প নেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমাদের পার্টি যখন এই ব্যাখ্যা রাখত, অনেকেই বুঝতে চাইত না। ওদের দেখিয়ে বলত, ওরাই খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টি, ওরাই বিপ্লব করবে। ওরা তখন গণআন্দোলনে ছিল, জনগণ তাদের আন্দোলনে দেখেছে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বারবার বলেছেন, এদের মুখে বিপ্লবী বুলি, লড়াই-লড়াই জঙ্গিভাব — এসবের আসল লক্ষ্য হচ্ছে ভোট। কংগ্রেস শাসনের ফলে মানুষের সমস্যা-সঙ্কট বাড়ছে, ক্ষোভ বাড়ছে, তাকে পুঁজি করে বিক্ষোভমূলক আন্দোলন গড়ে তোলা, তারপর ভোটে তা কাজে লাগানো। সিপিআই ও পরে সিপিএম নেতৃত্ব সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ তিনি দীর্ঘদিন ধরে বলেছেন। আজ বাস্তবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়েছে? ওদের দলের কর্মীরা অনেকে সৎ, সংগ্রামী। তারা প্রাণ ঢেলে ঐক্যবদ্ধ সিপিআই এবং পরে সিপিএমকে গড়ে তুলেছিল। তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়নি, অন্ধের মত নেতৃত্বকে সমর্থন করেছে। আজ তার পরিণতি কী? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, টাটার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না। এতটুকু লজ্জা হল না। অথচ টাটাকে কেউ ধরতেও যায়নি, ধরার প্রস্তাবও দেয়নি। টাটার জন্য কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন হচ্ছে। আগেকার দিনে জমিদারের 'বডিগার্ডরা' যেমন বলত, আমি বেঁচে থাকতে প্রভুর গায়ে হাত পড়বে না, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথাও অনেকটা সেরকম। এই টাটার স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি কৃষকদের রক্ত ঝরালেন।

মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক সভায় বলছেন, মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্ব চাই। এরকম মার্ক্সবাদ কেউ শোনেনি। মার্ক্সবাদের গোড়ার কথা হচ্ছে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম। পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমাগত সংগ্রাম তীব্র করবে, তার মধ্যে দিয়ে বিপ্লবের দিকে যাবে। আর এখানে সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী শ্রমিকদের বলছেন, মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্ব কর, লড়াই করোনা, ধর্মঘট করো না, শিল্পে অশান্তি করো না। যা টাটা-বিড়লার কথা, সাম্রাজ্যবাদীদের কথা, তাই আজ সিপিএম নেতাদের কথা। দলের মূল চরিত্র, দলের মূল রাজনীতিই তাঁদের আজ এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। আগামী দিনে এটা আরও সাংঘাতিক রূপ নেবে।

ফলে বাস্তবে এখন ঝাণ্ডার পার্থক্য ছাড়া কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপি-সিপিএমের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকছে না। সিপিএমের বহু কর্মী আফশোস করে আমাদের বলেন যে, 'সিপিএম দল শেষ হয়ে গেছে। আমাদের নেতারা সব শেষ করে দিয়েছে।' বলেন, 'আপনাদের দেখলে ভরসা পাই।' অনেক বৃদ্ধ প্রবীণ মানুষ একসময়ে যাঁরা ঘর-বাড়ি-কেরিয়ার ছেড়ে কাজ করেছেন ঐ পার্টির জন্য, এখন বলেন, 'আমাদের বয়স হয়েছে, আর সেই সুযোগ নেই। আপনারা এগিয়ে চলুন, আমরা আছি।' বহু জায়গায় সিপিএম-সিপিআই করা পুরানো লোকজন, বয়স্ক লোকজন অতীতের কথা ভাবেন, আর তাঁদের চোখে জল এসে যায়। দলের নেতারা এখন এঁদের কথার মূল্য দেয় না। সেজন্যই আমি বলছিলাম, সিপিএমকে দেখে মার্কসবাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা করবেন না।

আমরা লড়ছি কীসের জোরে? আমাদের দলের কর্মীরা যথার্থ মার্কসবাদের ভিত্তিতে, কমরেড শিবদাস ঘোষ এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে আদর্শের যে জীবন্ত রূপটি আমাদের দিয়েছেন তাকে হাতিয়ার করে লড়ছে। আর সিপিএমের মুখে মার্কসবাদ হচ্ছে ভণ্ডামি। কথায় আছে, গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয়না, খদ্দর পরলেই স্বদেশী হয় না — চরিত্র দেখতে হয়, বিচার করতে হয়, কথাগুলি ঠিক কি না। কথায় ও কাজে মিল আছে কি না দেখতে হয়। নাহলে ভণ্ডলোকেরা ঠকাবে।

মার্ক্সবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বোটানি ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষ বিশেষ নিয়মকে কো-অর্ডিনেট ও কো-রিলেট করে জেনারালাইজেশনের প্রক্রিয়ায় সাধারণ নিময়গুলি, যা ঐ বিশেষ নিয়মকেও নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের আবিষ্কারের পথেই এসেছে মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নিয়মগুলি। বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি, সমাজ — সকল সমস্যায়, সকল প্রশ্নে সত্য নির্ধারণে মার্কসবাদই একমাত্র বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। এই মার্কসবাদই দেখিয়েছে, কোন কিছুই চিরদিন থাকবে না। শোষণ চিরদিন ছিল না, চিরদিন থাকবে না। ইতিহাসের অনুদ্ঘাটিত অধ্যায়কে উদ্ঘাটন করে, সেই আদিম সমাজ থেকে সমাজ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি ও নিয়মকে বিচার-বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদ দেখিয়েছে, প্রকৃতি জগতের পরিবর্তনের যেমন নিয়ম আছে, সমাজের পরিবর্তনেরও তেমনি নিয়ম আছে। এই নিয়মকে জেনে-বুঝে এবং তার ভিত্তিতে ক্রিয়া করে সমাজকে পরিবর্তন করা যায়। মার্কসবাদকে অমান্য করা মানে একথা মেনে নেওয়া যে, সমাজে শোষণ থাকবে, মুনাফা থাকবে, ধনী-গরিব থাকবে, দারিদ্র-বেকারত্ব থাকবে, নারীধর্ষণ থাকবে, পতিতাবৃত্তি থাকবে, নারীপাচার থাকবে, অনাহারে মৃত্যু থাকবে। মালিকরা মানুষকে বোঝাবে, এ সবই অদৃষ্ট, কপাল, পূর্বজন্মের পাপের ফল। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে এসব মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছে

মার্কসবাদ। সেইজন্যই পুঁজিপতিরা মার্কসবাদকে ভয়ের চোখে দেখে। তারা কৃষি, শিল্প, যানবাহন, চিকিৎসা, সৌরজগৎ সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রয়োগ করছে। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজ বিচারে, মানুষের ভালমন্দ বিচারে, সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিচারধারা প্রয়োগে তাদের ঘোরতর আপত্তি। এখানে 'বিধাতার ইচ্ছাই কর্ম', নাহলে পুঁজিপতিশ্রেণীর নিজেদের অস্তিত্বই যে বিপন্ন হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপর্যয়, চীনের বিপর্যয় দেখে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সমাজতন্ত্রে এরকম বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়। মহান লেনিন নিজের হাতে বিপ্লব করেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ঠিক পথে না চললে সর্বনাশ হবে। স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, শিবদাস ঘোষ একই কথা বলেছেন। দেশের বাইরের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তি ও ভিতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি দালাল তৈরি করে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। মনে রাখবেন, সমাজতন্ত্র আবার আসবে। কারণ, সমাজতন্ত্র ছাড়া মানুষের সামনে বাঁচার আর কোনও পথই খোলা নেই। খোদ আমেরিকায়, ব্রিটেনে, ফ্রান্সে সঙ্কটজর্জরিত জনগণ মিছিলে স্লোগান তুলছে, সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। আমেরিকাতে তিন কোটি লোক ফুটপাতে থাকে, লঙ্গরখানায় খায়। এরা বাঁচবে কী করে?

আজ যারা মদের বোতল হাতে নিয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের বিরুদ্ধে কলম চালায়, তারা ইতিহাসের কিছুই জানে না। এদের কথা মানলে বলতে হয়, রমাঁ রলাঁ, বার্নাড শ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষচন্দ্র সবাই বুদ্ধিহীন ছিলেন! কারণ এঁরা সকলেই, মার্কসবাদী না হয়েও, সমাজতন্ত্রের জয়গান করে গেছেন। মনে রাখবেন, মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধতা করে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে না, কোন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলে না, সেই আন্দোলনে নৈতিক বলও থাকে না। কমরেড শিবদাস ঘোষ একথা বারবার বলে গেছেন।

সিপিএম-এর অনেকেই যেমন আমাদের বলেছেন, আপনারা লড়ুন, আপনারা আছেন বলেই আমরা ভরসা পাই; তেমনি তৃণমূলেরও নিচুতলার অনেকেই বলেন, 'আমরা জানি, আমাদের নেতারা বেশিদূর যাবে না। তারা সব উল্টোপাল্টা করছে। আমরা এস ইউ সি আই-কে জানি। এই দল থাকলে লড়াই ঠিকমত চলবে।' কেউ কেউ বলেন, 'এস ইউ সি আই আর তৃণমূল ঐক্য করে আন্দোলন করুক।' আমরা বলি, তা সম্ভব নয়। এখানে যদি তৃণমূলের কেউ থাকেন তাঁদের আমি বলে যেতে চাই, আমাদের যদি মন্ত্রীত্বের লোভ থাকত, এমএলএ-এমপি বনবার মোহ থাকত, তাহলে হয়ত তাঁদের সঙ্গে যেতাম। গত ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে সিপিএম আমাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে আমন্ত্রণ করেছিল, আমাদের সঙ্গে ভোটে ঐক্য চেয়েছিল। আমরা

বলেছিলাম, আপনাদের আমরা কোনদিনই কমিউনিস্ট মনে করি না। কিন্তু অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা করতেন, এখন তাও প্রায় বিসর্জন দিয়েছেন। আপনাদের সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস, বিজেপি সরকারের কোনও পার্থক্য থাকছে না। ফলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য হতে পারে না। এই কথা যখন বলেছি আমরা জানতাম, জয়নগর-কুলতলিতেও ওরা আমাদের নানা উপায়ে ভোটে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তবু আমরা দৃঢ়তার সাথে ঐ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এ দল গণআন্দোলনের, বিপ্লবী লড়াইয়ের। ইলেকশনে একটা সিট যদি না পাও না পাবে, একটা ভোটও যদি না পাও না পাবে, তবু নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিও না, গরিব মানুষের সঙ্গে বেইমানি কোরনা। আমরা আজও কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে দৃঢ়তার সাথে সেই পথে চলছি।

এবারকার ভোটে তৃণমূলের হয়েও একদল 'ফিলার' নিয়ে এসেছিল আমাদের কাছে। আমরা সেটাও প্রত্যাখ্যান করেছি। সিপিএম-এর সাথে থাকলে বা তৃণমূলের সাথে থাকলে আমাদের এম এল এ বাড়ত। সিপিএমের সাথে থাকলে তো মন্ত্রীত্বই পেতাম। আমরা তবু সেপথে যাইনি। এর কারণ কী? তৃণমূল একটা দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টি। এই সেদিন কেন্দ্রীয় সরকারে তারা বিজেপির সাথে ছিল এবং তৃণমূল যখন এনডিএ সরকারে ছিল সেইসময়ই এস ই জেড সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবারও সিঙ্গুরে আন্দোলন হওয়ার আগে তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় পুঁজিপতিদের মিটিং ডেকে বলেছিলেন, 'আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে নই।' অন্যদিকে আমাদের দল এস ইউ সি আই হচ্ছে, পুঁজিবাদবিরোধী-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দল। তৃণমূল কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দল নয়। কংগ্রেস-বিজেপির মতোই পুঁজিবাদের-সাম্রাজ্যবাদের ব্যাকিং-এ সরকারে আসতে চায়। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্ক রেখে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করে ওরা আন্দোলনের কথা বলে। তৃণমূল মনে করে, শিল্পায়ন সম্ভব, তবে সিপিএম পারবে না, তৃণমূল সরকারে গেলে পারবে। আমরা বলছি, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পায়ন অসম্ভব। এই স্লোগানটাই ভাঁওতা। কেন তা ধাপ্পা তা বুঝতে হলে মার্ক্সবাদকে জানতে হবে, না হলে বোঝা যাবে না। শিল্পায়নের ধাপ্পা দিয়েই পুঁজিবাদ কাজ হাসিল করতে চাইছে। একই স্লোগান শুধু সিপিএম-ই নয়, তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেসের কণ্ঠেও। স্পেশাল ইকনমিক জোনের স্কীমকেও তৃণমূল সমর্থন করছে। আমরা চাই, ভোটের দিকে তাকিয়ে আন্দোলন নয়, আন্দোলন হবে দাবি আদায়ের জন্য। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক হতে হবে। কারণ যতদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিন কৃষিজমির ওপর আক্রমণ আসবে; শ্রমিকের

ওপর, মধ্যবিত্তের ওপর আক্রমণ আসবে। তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য মার্ক্সবাদকে হাতিয়ার করে সর্বহারা বিপ্লব চাই। এখানেই আমাদের সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের মৌলিক পার্থক্য। আন্দোলনের নামে তৃণমূল কংগ্রেস আজ যেটা করছে, পঞ্চাশের দশকে-ষাটের দশকে মার্কসবাদের কথা বলে সিপিআই-সিপিএম অনেকটা সেই চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলনের স্লোগান তুলে মানুষের বিক্ষোভ জাগিয়ে, সে বিক্ষোভ থেকে ভোটের ফয়দা তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তৃণমূল নেতৃত্ব ঠিক তাই আজ করছে — যার জন্য অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, সিঙ্গুরেও জনগণ লড়তে চেয়েছিল, নন্দীগ্রামের মত রুখতে তারাও পারত, কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকার জন্য তা হতে পারল না। ওখানে এম এল এ তৃণমূলের, পঞ্চায়েত তৃণমূলের। আমাদের কিছু শক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু সিঙ্গুরে তৃণমূলের শক্তিই প্রধান। তৃণমূল নেতৃত্ব সেখানে লড়াই করতে দিল না। এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে। আপনারা অনেকেই জানেন না, সিঙ্গুরে প্রথম আন্দোলন শুরু করি আমরা, তৃণমূল নয়। এস ইউ সি আই আন্দোলন করছে দেখে পরে তৃণমূল ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষদের নিয়ে একটা পাবলিক কমিটি হয় — ''কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি''। এই কমিটিতে কনভেনার ঠিক হয় আমাদের একজন, তৃণমূলের একজন। সব জায়গায় আন্দোলনে আমরা যেমন করি, সিঙ্গুরেও তেমন আমরা পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি করেছি। যুবক, মহিলাদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী তৈরি করেছি প্রতিরোধ করার জন্য। আমরা চেয়েছিলাম, জমি অধিগ্রহণ করতে এলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। প্রয়োজনে তাকে লাগাতার চালিয়ে যেতে, যেমন পরে নন্দীগ্রামে হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল সেটা চায়নি। তারা শুধু চেয়েছিল, আন্দোলনের নামে এমন কিছু করতে যাতে তারা পাবলিসিটি পেতে পারে, তারা যে লড়ছে তা দেখানো যেতে পারে এবং এভাবে জনগণের ওপর তাদের প্রভাব বাড়াতে পারে। পুলিশ যখন জমি দখল করতে নামে তখন যে দু'দিন প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছিল, তাতেও জনগণের সঙ্গে আমাদের কর্মীদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। তৃণমূল নেতারা শুধুমাত্র আইনঅমান্য করে, জেলে গিয়েই তাঁদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন। এমনকী দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, শহীদ রাজকুমার ভুল ও তাপসী মালিকের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়েও সিঙ্গুরে এবং গোটা রাজ্যে কার্যকরী আন্দোলন করা গেল না মূলত ওদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য — যদিও আমরা সাধ্যমত করে গেছি। আমরা গোটা রাজ্যে শহীদ রাজকুমার ভুলের ও তাপসী মালিকের স্মরণে ৩ অক্টোবর ও ২৩ ডিসেম্বর শোকদিবস পালন করেছি। তৃণমূল নেতৃত্ব কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ২ ডিসেম্বর পুলিশ সিঙ্গুরে নৃশংস অত্যাচার চালাল, বাড়ি বাড়ি ঢুকে মারল, আগুন জ্বালাল, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলায় আমরা এককভাবে ৫ই ডিসেম্বর

২৪ ঘণ্টা বন্‌ধ ডেকেছিলাম। এইভাবে সিঙ্গুরের বুকে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া এবং তার সমর্থনে গোটা রাজ্যে বন্‌ধ ও সমস্ত জেলায় এসপি অফিস অবরোধের কর্মসূচি যখন আমরা পুলিশি আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে করছি, তখনই আচমকা তৃণমূল নেত্রী অনশন শুরু করলেন। যে লড়াই সিঙ্গুরের মাটিতে হওয়া দরকার ছিল, যে লড়াইকে গোটা রাজ্যে জেলায় জেলায় প্রসারিত করার দরকার ছিল, সেটাকে কলকাতায় এক ব্যক্তির অনশন মঞ্চে সীমাবদ্ধ করা হল। একথা ঠিক, অনশন করতে গিয়ে তিনি শারীরিক কষ্ট ভোগ করেছেন, অসুস্থ হয়েছেন, সংবাদমাধ্যমে তাঁর প্রচারও হয়েছে, কিন্তু ফল কী হল? গোটা রাজ্যের দৃষ্টি চলে গেল সিঙ্গুরে আন্দোলনের পরিবর্তে অনশন মঞ্চের দিকে — যেন অন্য কোন আন্দোলনের দরকার নেই, অনশনই সব ঠিক করে দেবে। কয়দিন অনশন চলবে, কীভাবে অনশনের সমাপ্তি ঘটবে, রাজ্যপাল থেকে শুরু করে কোন্ কোন্ নেতা-মন্ত্রী অনশন মঞ্চে এলেন, এ নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলল, আর আন্দোলন পিছনে চলে গেল। তারপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরামর্শের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী সবকিছু নিয়ে আলোচনা করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনশন ভঙ্গ হল। সিঙ্গুরের জমি দখলও করবেন এবং সবকিছু নিয়ে আলোচনাও করবেন, এ'কথা তো মুখ্যমন্ত্রী আগেও বলেছিলেন। তৃণমূল নেত্রী নতুন কী পেলেন? আর এখন তৃণমূল নেত্রী বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করতে তাঁকে কে বলেছিল? কিন্তু নন্দীগ্রাম এ ভুল করেনি। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তৃণমূল নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল না। আমাদের দলই প্রথমে আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সিপিআই-সিপিএম-তৃণমূল ও কংগ্রেসের এবং কোন দল করে না এমন লোকজন — সকলকে নিয়েই পাবলিক কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল। এই কমিটির আহ্বানে নন্দীগ্রামের জনগণ সাড়া দিয়েছে। আমাদের কর্মীরা পাড়ায়-পাড়ায় গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছে। নন্দীগ্রামের যে এলাকায় প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছে সেটা মূলত সিপিএমের ঘাঁটি ছিল। সেখানকার জনগণই বীরের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম করে সরকারকে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে, নোটিশ জারি করে ভুল করেছি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকেই নন্দীগ্রামের সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে। এখানে তেভাগা আন্দোলন হয়েছে। ৮০'র দশকে এখানে নন্দীগ্রাম উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। সিঙ্গুরের লড়াই নন্দীগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু নন্দীগ্রাম যা পারল, এখনও পর্যন্ত সিঙ্গুর তা পারেনি। নন্দীগ্রামের জনগণের সংগ্রামী দৃঢ়তা, তাদের প্রতি পশ্চিমবাংলার ও ভারতবর্ষের জনগণের প্রবল সমর্থনের ফলে সিপিএম এখনও পর্যন্ত পুলিশ ও সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী নিয়ে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি, তারা সুযোগ খুঁজছে।

তৃণমূল সিঙ্গুরে ব্যর্থ হয়ে নন্দীগ্রামে ভোটের জমি তৈরির জন্য সিপিএমের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাচ্ছে, যেটা সিপিএমকে সুযোগ করে দিচ্ছে আবার আক্রমণের। এর ফলে নন্দীগ্রামে অর্জিত জয় বিপন্ন হচ্ছে। আন্দোলনের চাপে তৃণমূল পাবলিক কমিটিতে এলেও এই কমিটির মতামতের তোয়াক্কা না করেই তারা নিজেদের দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে যা মনে করছে তাই করছে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। তাহল, কোন গণআন্দোলন ঠিকমত চালাতে হলে, জিততে হলে, সঠিক সংগ্রামী রাজনীতি তো চাই-ই, তার সাথে সঠিক কর্মসূচি ও রণকৌশলও চাই। যার বিরুদ্ধে লড়াই, তার রাজনীতি, কর্মধারা. প্রচার, আক্রমণ, কলাকৌশল এসব বুঝেই এটা ঠিক করতে হয়। তৃণমূল এসবের বিশেষ ধার ধারে না। ভোটের রাজনীতিই তাদের একমাত্র রাজনীতি।

আপনারা জানেন, বর্তমান আন্দোলনে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক-খেতমজুরদের তথা এ'রাজ্যের এবং সমগ্র দেশের জনগণের দাবি হচ্ছে, কৃষিজমি ধ্বংস করা চলবে না, আবাসন ও কিছু শিল্প করতে হলে তা অকৃষি জমি ও বন্ধ কল-কারখানার জমিতেই করতে হবে। অথচ তৃণমূল নেতৃত্ব এই মূল জায়গা থেকে সরে এসে দাবি তুলছে, জমি দিতে যারা অনিচ্ছুক তাদের জমি ফেরৎ দিতে হবে। কারা ইচ্ছুক ও কারা নয়, এভাবে ভাগ করার দ্বারা বাস্তবে চাষীদের মধ্যে অনৈক্যই সৃষ্টি করা হচ্ছে, আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সিপিএম কিন্তু সিঙ্গুরে এই দাবি না মানলেও অন্যত্র প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে এই 'ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক' দাবি লুফে নেবে। কারণ, সিপিএম জানে, লোভ দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে সরকারি দল হিসাবে তাদের পক্ষে এমন 'ইচ্ছুক'-এর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে নেওয়ার বিশেষ অসুবিধা হবে না।

কেন তৃণমূল মূল দাবি থেকে সরে এল? আসলে তৃণমূল নেতৃত্ব পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করতে চায়। নিজেদের 'দায়িত্বশীল বিরোধী' প্রমাণ করতে চায়। অথচ কৃষিজমি এভাবে ধ্বংসের পরিণাম দেশের পক্ষে ভয়াবহ। এর ফলে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন মার খাবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়বে — যেটা সাম্রাজ্যবাদীরা চাইছে এবং ইতিমধ্যে সে প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছে।

এখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই ঐতিহাসিক শিক্ষা উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন, শুধু লড়লে, রক্ত ঢাললে, প্রাণ দিলেই হবে না। লড়াইয়ের নেতৃত্ব, রাজনীতি, লড়াইয়ের রাস্তা সঠিক হওয়া দরকার। ফলে, রাস্তা ঠিক হলে সিঙ্গুর আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। সিঙ্গুরে এখনও প্রতিবাদের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। আবার ঠিকমতো সংগঠিত হলে ব্যাপকভাবে গণআন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠতে পারে। তৃণমূলের নীচুতলার যাঁরা কর্মী তাঁরা সাধারণ ঘরেরই মানুষ। সিপিএমের অত্যাচারে

অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা তৃণমূল করছেন। তাঁদের বলছি, আমাদের কথাগুলো আপনারা ভেবে দেখুন।

তৃণমূল নেতৃত্ব কখনও কংগ্রেসের সাথে, কখনও বিজেপি'র সাথে চলছে। আসলে সবটাই ভোটের হিসাব। কংগ্রেস, বিজেপিও একই হিসাব করে আন্দোলনের মহড়া দিচ্ছে। আর, তাদের সরকারই অন্য রাজ্যে কৃষিজমি দখল ও সেজ চালু করছে। গোটা রাজ্যের জনগণ আজ সিপিএম বিরোধী। এই বিরোধিতাকে পুঁজি করে এইসব শক্তি আগামী পঞ্চায়েত, লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে নিজেদের জমি তৈরি করছে, এরা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনা। আমরা এই ভোটসর্বস্ব রাজনীতির মধ্যে নেই। আপনারা আমাদের জানেন। ১৯ বছর ধরে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করেছি, বুদ্ধিজীবীরা এবং আপনারা সকলে সঙ্গে ছিলেন। আমরা দাবি আদায় করেছি। অন্য কোন রাজনৈতিক দল সেই লড়াইয়ে আসেনি। প্রতি বছর ব্যাপক সাধারণ মানুষ ও আমাদের দলের কর্মীদের উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরে বৃত্তিপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। এরকম উদ্যোগ অন্য কোন দল ভাবতে পারে না। এটাও একটা আন্দোলন। আমরা আন্দোলন করে কয়েকবার স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির বেতন কমিয়েছি, মেডিকেল কলেজে ছাত্র বেতন কমিয়েছি। আমরা আন্দোলন করে হাসপাতালের চার্জ কিছুটা কমিয়েছি। বিদ্যুৎ মাশুল, কৃষিবিদ্যুৎ মাশুল আন্দোলন করে খানিকটা হলেও কমানো হয়েছে। আমরা আন্দোলন করে সাহারা কোম্পানিকে সুন্দরবনের নদী ইজারা দেওয়া ঠেকিয়েছি। সরকার দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং পুরুলিয়ায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে গিয়েছিল, আমরা আন্দোলন করে ঠেকিয়েছি। চটকলে শ্রমিকদের বেতন কমানোর জন্য কালা চুক্তি করেছিল রাজ্য সরকার এবং কংগ্রেস-সিপিআই-সিপিএমের ইউনিয়ন। আমরা আন্দোলন করে আটকেছি। বিড়ি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মালিকরা মেরে দিচ্ছিল, আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। আর্সেনিকের আক্রমণে বহু মানুষ মারা গেছে। এ ব্যাপারে আমরা আন্দোলন করে কিছুটা দাবি আদায় করেছি। পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলায় জেলায় পাচার হওয়া বহু নারী উদ্ধার করিয়েছি। এরকম ছোট-বড় বহু আন্দোলনে আমরা দাবি আদায় করেছি। বারো-তেরো বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনশিক্ষা চালু করতে চাইছে সরকার, তার বিরুদ্ধেও আমরা লড়ছি। এইডস রোগ প্রতিরোধ করার নামে নোংরা বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ছি। এরকম বহু লড়াই হচ্ছে। আর কোন্ দল এইসব দাবি নিয়ে লড়ছে ? জনগণকে নিয়েই আমরা লড়ছি। আমাদের শক্তি জনগণ।

আমাদের খবর রেডিও, টিভি, খবরের কাগজে পাবেন না। এদের প্রচার ছাড়াই

মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই এগিয়ে চলেছে। শাসকশ্রেণী এর ফলে আতঙ্কিত। ওরা চায়, মানুষ এস ইউ সি আই-এর কথা না জানুক। সাংবাদিকরা আপনাদের ঘরেরই ছেলেমেয়ে। তাঁরা আমাদের অফিসে আসেন। বলেন, 'আপনাদের বক্তব্য শুনতে ভাল লাগে বলে আসি। কিন্তু আমাদের কাগজে, আমাদের টিভি চ্যানেলে আপনাদের কোনও জায়গা নেই।' সংবাদমাধ্যমকে কন্ট্রোল করে পুঁজিপতিরা। তারাই ঠিক করে কোন্ দলকে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারে রাখবে, কোন্ কোন্ দলকে বিরোধী আসনে রাখবে। সেভাবেই প্রচার চালাতে নির্দেশ দেয়। ফলে কোন্ দল ঠিক বা বেঠিক তা আপনারা সংবাদপত্র পড়ে বুঝতে গেলে ঠকবেন। এই করে অতীতেও আমাদের দেশের মানুষ ঠকেছে। সেজন্যই বারবার যাতে ঠকতে না হয়, তার জন্য আপনাদের সতর্ক করতে চাইছি।

যেকোন আন্দোলনকে সফল করতে হলে সঠিক বিপ্লবী আদর্শ দরকার, সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি দরকার, আর দরকার উন্নত চরিত্র, নৈতিক বল — একথা বলেছিলেন মহান নেতা শিবদাস ঘোষ। তিনি আরও বলেছিলেন, কামান-বন্দুক দিয়ে একটা লড়াইকে ধ্বংস করা যায় না। কামান-বন্দুকের চেয়ে বড় আক্রমণ হচ্ছে, মনুষ্যত্ব মেরে দাও, চরিত্র মেরে দাও — যেটা সবচেয়ে বেশি আজ আমাদের দেশে ঘটছে। এই মেদিনীপুর জেলা ভারতবর্ষে একসময় একটা তীর্থস্থানের মত ছিল। বিদ্যাসাগর এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি রেনেশাঁসের ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত সেকুলার মানবতাবাদের পতাকা বহন করেছিলেন। মেদিনীপুরেই ভারতবর্ষের প্রথম বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামের উত্থান ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর এবং ক্ষুদিরামের ঐতিহ্যময় যে মেদিনীপুর, তা গোটা ভারতবর্ষের গর্ব। সেই মেদিনীপুরের আজকে চেহারা কী? গোটা ভারতবর্ষের চেহারা কী? ওরা মদ, জুয়া, সাট্টা, ব্লু-ফিল্ম, নোংরা সিনেমা, নোংরা বইপত্রের স্রোতের মধ্যে গোটা যৌবনকে ডুবিয়ে দিয়েছে। সেই মনুষ্যত্ব নেই, সেই যৌবন নেই। এভাবে নৈতিকতার ক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। সিপিএমের এক নেতা যিনি প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের নিয়ে নোংরা উক্তি করেন, তিনি নাকি ঐ দলের কর্মীদের আদর্শের ট্রেনিং দেন, চরিত্রের ট্রেনিং দেন। যে দলের নেতার রুচি-সংস্কৃতি এত নিম্নজাতের সেই দলের কর্মীদের কী চরিত্র হবে বলুন! তাই ক্রিমিনালে ভরে গিয়েছে ঐ দল।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, দেশের অবস্থা ফেরাতে হলে যৌবনকে নতুন করে জাগাতে হবে। মনুষ্যত্বকে নতুন করে জাগাতে হবে। তার জন্য চাই আরেকটা আন্দোলন। সে আন্দোলনের সূচনা করেছেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন। ভারতবর্ষের মানুষ ভুলে গিয়েছিল। কমরেড শিবদাস ঘোষের

শিক্ষার ভিত্তিতে এই ১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরাম দিবস প্রতি বছর আমরা উদ্‌যাপন করি। কলকাতায় আমরাই প্রথম ক্ষুদিরামের বিপ্লবী মূর্তি স্থাপন করি। আমরাই ২৩ মার্চ শহীদ ভগৎ সিং দিবস উদ্‌যাপন করাই। আমাদের কর্মীরা শরৎ জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, নেতাজী জয়ন্তী, বিদ্যাসাগর জয়ন্তী, রবীন্দ্র জয়ন্তী মর্যাদার সঙ্গে পালন করে। এই জেলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় বিমল দাশগুপ্ত মহাশয় অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিলেন। আমরা পশ্চিমবাংলার জনগণের কাছে আবার তাঁকে নিয়ে গিয়েছি। এই শহরের নাগরিকদের সহযোগিতায় তাঁর একটা মূর্তি এখানে স্থাপিত হয়েছে। এগুলো এমনি এমনি আমরা করি না। আমরা বহন করছি কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি অমূল্য শিক্ষা। তিনি বলেছেন, অতীত যুগের বড় মানুষদের কাছ থেকে, বিপ্লবীদের কাছ থেকে শেখো। আজকের দিনে মার্ক্সবাদী বিপ্লবী হতে হলে পুরনো দিনের বড় মানুষদের থেকে, পুরনো দিনের বিপ্লবীদের থেকে শিখতে হবে। এ একটা আন্দোলন। এটা আমাদের দলের একটা জীবন্ত সাধনা।

আমাদের ছেলেমেয়েরা পুলিশের মার খায়, রক্ত ঝরায়। আমাদের ২৮ জন নেতা-কর্মী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আমাদের ১৪১ জন নেতা-কর্মীকে সিপিএম খুন করেছে। অন্য কোন দলের এত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমাদের ৩৪৩ জনের বিরুদ্ধে মার্ডার কেসের মামলা চলছে এবং সবগুলিই মিথ্যা মামলা। কিন্তু সিপিএম পারেনি আমাদের নত করাতে। এই শক্তি আমাদের কর্মীরা কোত্থেকে পায়? সরকারের, এমএলএ-এমপি'র জোরে? প্রচারের ব্যাকিং-এ? না, এ হচ্ছে বিপ্লবী আদর্শের শক্তি। মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার শক্তি। এটাই আমাদের শক্তির উৎস।

তাই আপনাদের বলতে চাই, এই আন্দোলন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাব। এর জন্য চাই এলাকায় এলাকায় গণকমিটি, ভলান্টিয়ার বাহিনী। যেসব জায়গায় কৃষিজমি দখল হচ্ছে না, সেখানেও অন্যান্য দাবিতে এই গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে আপনারা গড়ে তুলুন। আর চাই চরিত্রের সাধনা। আর ভোটের রাজনীতির স্বার্থে যারা আন্দোলনে আছে তাদের সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। নিচুতলায় যে গণকমিটি হবে তাতে সিপিআই-সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূল সমস্ত দলের লোকজন আসুন। যাঁরা এই আন্দোলনের পক্ষে আমরা তাদেরই চাই। আমরা বলব, অন্ধের মত কাউকে মানবেন না। আমাদেরও বিচার না করে বিশ্বাস করবেন না। গণকমিটি বসে বিভিন্ন দলের কর্মসূচি-নীতি নিয়ে আলোচনা করবে, বিচার করবে। তার ভিত্তিতে তারা কার্যক্রম ঠিক করে আন্দোলন করবে। সমস্ত জায়গায় এই গণকমিটিগুলি এবং ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা দরকার। এই আহ্বানটা দলের তরফ থেকে আমি আপনাদের সামনে রাখছি। আবার আমি আপনাদের

অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই বিশ্বাস রাখি যে, এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য, সফল করার জন্য আপনারা সর্বাত্মক সাহায্য করে যাবেন। আর আমাদের দলের বক্তব্য যদি সঠিক মনে করেন, আপনারা যাঁরা প্রবীণ তাঁরা সহযোগিতা করবেন, যাঁরা যুবক তাঁরা এগিয়ে আসবেন, যাতে আমাদের দল আরও শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

[এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ, ২-২-০৭]

গণআন্দোলনকে পঙ্গু করে দিতেই সিপিএম-কে সরকারে বসানো হয়

বহরমপুরের জনসভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-বারুইপুর-হলদিয়া সহ রাজ্যের সর্বত্র কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে এবং ৭ ফেব্রুয়ারি নন্দীগ্রামে কৃষকহত্যার প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে ২০ জানুয়ারি, ২০০৭ এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিশ্বায়নের নীতি কার্যকরী করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের চেয়ে এক পা এগিয়ে। 'বাজার সমাজতন্ত্রে'র নামে যে দেঙ শিয়াও পিং চক্র সমাজতান্ত্রিক চীনকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত করে দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণ-লুণ্ঠনের স্বর্গে পরিণত করেছে, তাদের চালু করা 'স্পেশাল ইকনমিক জোন'এর মডেল পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে সিপিএম বদ্ধপরিকর। আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক মুখে বিরোধিতা করলেও মন্ত্রীত্বের চাকরি ছাড়তে পারছে না। বামফ্রন্ট শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, উন্নয়নের বুলি আওড়াচ্ছে। অথচ ছাপ্পান্ন হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে আত্মঘাতী হচ্ছে। প্রাণ চলে যাচ্ছে। এদের চোখের জলের হিসাব কে রাখে? আপনারা সাধারণ মানুষ নিশ্চয় এ খবর রাখবেন। সমবেত জনতার উদ্দেশে কমরেড মুখার্জী বলেন, জমি-রক্ষার লড়াইটা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে হবে না। কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের মত সংসদীয় দলগুলো এ রাজ্যে জমিরক্ষার পক্ষে লড়াইয়ের হুঙ্কার দিচ্ছে। অথচ এরাই বিশ্বায়নের প্রবক্তা। অন্য রাজ্যে এই কংগ্রেস-বিজেপি চাষীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। সিপিএম সেখানে আবার আন্দোলন-আন্দোলন খেলা খেলছে।

কমরেড মুখার্জী বলেন, পরাধীন ভারতে এই বাংলার বিপ্লববাদী আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসকরাও এরাজ্যের বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধাক্কায় বেসামাল হয়েছে। কংগ্রেসের জওহরলাল নেহেরুর কাছে কলকাতা ছিল 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'মিছিল নগরী'; কারণ, এরাজ্যের জনগণ শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সর্বদা আগুয়ান ছিল, যা গোটা দেশের সাধারণ মানুষকে প্রেরণা দিত, আন্দোলনমুখী হওয়ার আহ্বান

জানাতো। এ জায়গায় ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ভয় পেয়েছে, ফন্দি করেছে কী করে এই সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা করে দেওয়া যায়! এ ব্যাপারে সিপিএমের মতো দলই যে তাদের সবচেয়ে ভাল সার্ভিস দিতে পারে, সেটা চিনতে তাদের ভুল হয়নি। এজন্যই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণী সিপিএম-কে দেদার টাকা ও প্রচার দিয়ে ভোটে জিতিয়ে বারবার ক্ষমতায় বসাচ্ছে। প্রতিদানে সিপিএম ৩০ বছরের শাসনে রাজ্যের জনগণের প্রতিবাদী ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনাকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিয়ে সাধারণভাবে আন্দোলনবিরোধী পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে যেখানে মিছিল-বন্‌ধ-ধর্মঘট

দেখলে মানুষ বিরক্ত হয়; জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে বন্‌ধ ধর্মঘট ডাকলে, তার বিরুদ্ধেও যে কেউ অনায়াসে 'জনস্বার্থ মামলা' (PIL) ঠুকে দিতে পারে। আজকের অবস্থা দেখলে মনে হয়, আজ যদি নেতাজী থাকতেন এবং দেশের জন্য জনগণকে রক্ত দেওয়ার আহ্বান জানাতেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধেও হয়তো 'জনস্বার্থ মামলা' করা হত। এই যে আজকের চরম সংগ্রামবিমুখ পরিবেশ, এর বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের কৃষকরা। তারা প্রতিরোধ আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার করে সিপিএম ও পুঁজিপতিশ্রেণীর বুকে কাঁপন ধরিয়েছে।

তিনি বলেন, এস ইউ সি আই বরাবর যুক্ত আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করেছে। অতীতে একসময় সিপিএম যখন ভোটের স্বার্থে হলেও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছিল, তখন আমরা যৌথ আন্দোলন করেছি। এখন সিপিএম সরাসরি পুঁজিবাদী শিবিরে যোগ দিয়েছে। '৯০ সালে নকশালপন্থীদের সাথে আমরা যৌথ আন্দোলন করেছি, যা তাদের সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য আর সম্ভব হয়নি। ফলে, একক শক্তিতেই গণআন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের দলের উপর বর্তেছে। আমরা তা গড়ে তুলছি এবং জনগণের সাড়াও পাচ্ছি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমাদের হাতিয়ার। আজকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধির উপর নির্ভর করছে।

শিল্পায়ন? বীরভূম জেলাতেই একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে

সিউড়ির জনসভায় কমরেড প্রতিভা মুখার্জী

এস ইউ সি আই বীরভূম জেলা কমিটির ডাকে ২৯ জানুয়ারি, ২০০৭ সিউড়ি পুরাতন হাসপাতাল মাঠে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কুদ্দুস আলী সভাপতিত্ব করেন।

সভার প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী তাঁর ভাষণে বলেন, আজ সিপিএম-এর এই চেহারা দেখে অনেকেই বিস্মিত। তাঁরা বলছেন, সিপিএম মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত। কিন্তু আমরা জানি, সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিল না। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুপূর্বেই দেখিয়েছেন, এরা মার্কসবাদের কথা বললেও, আসলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি —সোস্যাল ডেমোক্র্যাট। তাদের সেই চেহারা আজ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ৩০ বছর একটানা ক্ষমতায় থেকে তারা দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নির্লজ্জ সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই চূড়ান্ত সঙ্কটের দিনে আজ যে আর শিল্পায়ন সম্ভব নয় — এই সত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে আড়ালে করে শিল্পায়নের ভাঁওতা দিয়ে হাজার হাজার একর জমি কেড়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ কৃষককে ভিখারিতে পরিণত করছে। ওরা শিল্পায়নের কথা বলছে, অথচ এই বীরভূম জেলাতেই একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো খোলার চেষ্টা কই? এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আজ শুরু হয়েছে প্রতিরোধ। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আজ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে মুষ্টিমেয় মালিক ও তার সেবাদাসরা, অন্যদিকে কোটি কোটি কৃষক ও শ্রমজীবী জনগণ। প্রবল গণবিক্ষোভের সামনে পড়ে আজ সিপিএম নেতৃত্ব থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তারা সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের রক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে। ফলে জমি অধিগ্রহণ সহ কোনও জনবিরোধী নীতিকে তারা ছাড়বে না, যদি না তীব্র গণআন্দোলনের দ্বারা তাদের ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। মানুষকে মিথ্যা বলে, ভুল বুঝিয়ে, অত্যাচার করে এই নীতিকে কার্যকর করার ষড়যন্ত্র করবে। তাই গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামী জনগণের ঐক্যের ভিত্তিতে গণকমিটি, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, এলাকায় এলাকায় গণপ্রতিরোধ; দু'একজন নেতা-নেত্রীর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভোটের লড়াইয়ের আন্দোলন নয়। তিনি বলেন, এর জন্য চাই আন্দোলনের

সঠিক লাইন, সঠিক নেতৃত্ব। কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন, কোন আন্দোলন তখনই শক্তিশালী হতে পারে, অমোঘ হতে পারে, জয়যুক্ত হতে পারে, যখন তা সঠিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারের উপর গড়ে ওঠে। এই শিক্ষার ভিত্তিতেই আমাদের দল গণআন্দোলন গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ সহ জনজীবনের বহু সমস্যা নিয়ে আমরা একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলছি। গুরুত্বপূর্ণ দাবিও কিছু আদায় করতে পেরেছি। আজ শুধু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নয় — যেখানেই কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সেখানেই পড়ে থেকে তৃণমূল স্তর থেকে এই আন্দোলনকে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে গড়ে তুলে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থনও আমরা পাচ্ছি। পরিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

[গণদাবী : ৫৯ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ৯-২-০৭]

সংগ্রামী বামপন্থার নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

এস ইউ সি আই-এর আহ্বান

বন্ধুগণ,

এ রাজ্যে ও দেশের সর্বত্র প্রবল প্রতিবাদ ও ধিক্কারে কোণঠাসা সিপিএম নেতৃত্ব শরিক দলগুলির সাথে বৈঠকের পর যে কথা ঘোষণা করেছেন তা দেখে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, তাঁরা ভুল বুঝতে পেরে বলছেন, 'নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না', বা গণহত্যা চালিয়ে অনুতপ্ত হয়ে 'দুঃখপ্রকাশ করছেন', এবং আর 'পুনরাবৃত্তি হবে না' বলে জানাচ্ছেন। জনগণ এখনো ভুলে যাননি, ইতিপূর্বে ৭ই জানুয়ারি তিন জনকে খুন করে ও প্রচুর রক্তপাত ঝরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঠিক একইভাবে বলেছিলেন, 'আমাদের ভুল হয়েছে, জনগণের সম্মতি ছাড়া নন্দীগ্রামে জমি নেওয়া হবে না।' তারপর প্রায় আড়াই মাস নন্দীগ্রামকে সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী দিয়ে অবরুদ্ধ রেখে ক্রমাগত হামলা চালিয়েও যখন দেখলেন, জনগণের মাথা নত করানো গেল না, তখন ১৪ মার্চ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বাছাই করা পুলিশ বাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র ক্রিমিনাল নিয়ে তারা নন্দীগ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর তো ইতিহাসের এক রক্তাক্ত অধ্যায়, যা নিষ্ঠুরতায়, হিংস্রতায়, বর্বরতায় ব্রিটিশ যুগের জালিয়ানওয়ালাবাগ ও বিজেপি শাসিত দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাটকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিন কত হতাহত হয়েছে, তার প্রকৃত সংখ্যা জানা কঠিন। গ্রামবাসীদের মতে অনেক মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছে, পাশের খেজুরির ইটভাটার আগুনে পোড়ানো হয়েছে, বেশ কিছু গাড়ি বোঝাই মৃতদেহ বাইরে পাঠানো হয়েছে, অজানা দূরে, হয়ত নদীগর্ভে। বহু নারী অপহৃতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা হয়েছেন।

নন্দীগ্রামের সর্বত্র আজ কান্নার রোল। সন্তানহারা জননী, পিতৃমাতৃহীন সন্তান, স্বামীপুত্র- হারা নারী, সকলেই কাঁদছেন। কাঁদছেন লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা নারী, আর্তনাদ করছেন আহতেরা। এ দৃশ্য মর্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারক। মুখ্যমন্ত্রীর 'দুঃখপ্রকাশ' কী সান্ত্বনা দেবে এঁদের — যে মুখ্যমন্ত্রী দু'দিন আগে এই গণহত্যার সাফাই দিতে গিয়ে বৃটিশ ও কংগ্রেস শাসকদের ভাষায় বলেছিলেন, 'পুলিশ শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গিয়েছিল। জনতা আক্রমণ করায় আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়।' এতটুকু আত্মসমালোচনা নেই, অনুশোচনা নেই, নির্লজ্জভাবে এতবড়

মিথ্যা কথা বলে গেলেন! এই মধ্যযুগীয় নৃশংসতার পরও যখন নন্দীগ্রামবাসীরা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছেন, যখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, গোটা দেশে প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে, যখন দলে দলে সিপিএম ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা পদত্যাগ করে প্রতিবাদে রাস্তায় নামছেন, প্রবল জনরোষের অভিব্যক্তি রূপে ১৬ মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত ঐতিহাসিক বাংলা বন্ধ হয়ে গেল, ঐ দিনই নন্দীগ্রামবাসীরা সিপিএম ক্রিমিনালদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিল, জনতার ক্রোধে পুলিশবাহিনীও যখন ভয়ে কাঁপছিল, এসব দেখে তখনই সিপিএম নেতারা বুঝে গিয়েছিলেন, আর নন্দীগ্রামে জমি দখল করা সম্ভব নয়। তাঁরা কোনরকমে মুখরক্ষার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিন শরিক দল সেই সুযোগ এনে দিল, প্রবল তর্জনগর্জন ও 'মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের হুমকি' দিয়ে। ধূর্ত সিপিএম নেতৃত্ব সেটাকে দ্রুত কাজে লাগালেন। যে শর্তে তিন দল তাদের হুমকি তুলে নিল তা তাদের দলীয় কর্মী ও জনগণের প্রতি প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

অথচ জনগণের মূল দাবি হচ্ছে ঃ (১) এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের জন্য দায়ীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে, (২) নিহত ও আহতদের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে, (৩) খুনি সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, (৪) কেন্দ্রের বন্ধু কংগ্রেস সরকার পরিচালিত সিবিআইকে দিয়ে নয়, বিচারপতি-আইনবিদ-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে, (৫) রাজ্যের কোথাও স্পেশাল ইকনমিক জোন (সেজ) করা চলবে না, (৬) কোথাও শিল্পের নামে চাষযোগ্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হবে না, (৭) সিঙ্গুরে দখল করা জমি চাষীদের ফেরত দিতে হবে, (৮) বন্ধ শিল্প খুলতে হবে, অকৃষি জমিতে শিল্প স্থাপন করতে হবে। এইসব দাবি নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য তিন দল বা সিপিএম কেউই করল না। ফলে এটা পরিষ্কার, কিছুটা সময় কাটিয়ে গণআন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত হলে আবারও তারা কৃষিজমি দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, জনগণ প্রতিরোধ করলে আবারও রক্তপাত, খুন, ধর্ষণের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সিপিএম সাধারণ সম্পাদকও বলেছেন, আপাতত জমি নেওয়া হবে না। এই 'আপাতত' শব্দটা লক্ষণীয়।

জনগণ বেকার সঙ্কটের সমাধান চায়, চায় শিল্পের বিস্তার ঘটুক, চায় শিল্প গড়া সম্ভব হলে তা চাষের জমিতে নয়, অকৃষি পতিত জমিতে হোক। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজকের সঙ্কটজর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যথার্থ শিল্পায়ন কি সম্ভব? প্রকৃত শিল্পায়ন কথাটার মানে হল, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমবর্ধমান বাজারের চাহিদা অনুযায়ী লাগাতার শিল্প হচ্ছে। এটা কি আজকের দিনে সম্ভব? দীর্ঘ শোষণে শোষণে নিষ্পেষিত বিশ্বের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এতই কমে যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি বর্তমানে উৎপাদন শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে ক্রমসঙ্কুচিত বাজার সঙ্কটে

ধুঁকছে। উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেই কোটি কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, মৃতপ্রায় শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য শ্রমিক কমানো বা 'ডাউন সাইজিং' করা হচ্ছে। স্বল্প শ্রমিক নিয়ে ২/১০টা শিল্প যা হচ্ছে, তাকে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাই আখ্যা দিচ্ছেন, 'কর্মহীন উন্নয়ন' বা 'জবলেস গ্রোথ'। সাময়িকভাবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করানোকে তাঁরাই বলছেন, 'বাব্‌ল ইকনমি', বা বুদবুদের মত ক্ষণিক ফুলে ওঠে ফেটে যাওয়া। এই সঙ্কটের জন্যই সাম্রাজ্যবাদীরা নয়া ঔপনিবেশিক কর্মসূচীর সর্বশেষ স্কীম গ্লোবালাইজেশন এনে অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় বাজারের নড়বড়ে প্রাচীর ধূলিসাৎ করে মাল্টিন্যাশানাল ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে গোটা বিশ্বকে অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে, যদিও লুঠের ভাগ ও ক্ষেত্র নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিরোধ-রেষারেষি চলছেই।

ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিবাদ ইতিপূর্বেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এই গ্লোবালাইজেশানের অংশীদার হয়েছে। এদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের রক্ত শুষে তৈরি লগ্নিপুঁজি নিয়ে ধনকুবের টাটা-বিড়লা-আম্বানীরাও বিদেশে, এমনকী খোদ মার্কিন দেশে ও ইংল্যান্ডে ইন্ডাস্ট্রি কিনছে, অন্য দেশের শিল্পের সাথে মার্জার করছে বা মিলে যাচ্ছে। অলস পুঁজিকে পুঁজিপতিরা শেয়ার মার্কেটের ফাটকাবাজিতে, সুদের কারবারে, নির্মাণকাজে এবং হাউসিং বা রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ে, প্রমোটারীতে ঢালছে। সাম্রাজ্যবাদ, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তরে পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে, এটা দেখিয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন ১৯১৬ সালেই বলেছেন, বিশ্ব পুঁজিবাদ অনিবার্যভাবেই এইসব সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। আর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই বলেছেন, আজকের দিনে কৃষির যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ এবং লাগাতার শিল্পায়নের মাধ্যমে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ৫৬ হাজার শিল্প বন্ধ, বহু রুগ্ন শিল্প ধুঁকছে, ১৭ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই, ১ কোটির উপর বেকার — এ অবস্থায় সিপিএম ও দক্ষিণপন্থীরা যখন তারস্বরে শিল্পায়নের জিগীর তুলছে, তখন তাকে ধাপ্পা ছাড়া আর কী বলা যায়? বড়জোর স্বল্প শ্রমিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর ২/৫টা শিল্প এখানে সেখানে হবে, আর মূলত হবে উপনগরী, প্রমোটারীর ব্যবসা, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদি। তার জন্য কলকাতার কাছাকাছি জমি চাই, কৃষিজমি হওয়া সত্ত্বেও চাই, কিন্তু দূরবর্তী

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে অকৃষি জমি থাকলেও চলবে না।

১৯৬৪ সালে 'শোধনবাদী ডাঙ্গে চক্র নিপাত যাক', 'সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ' এইসব গরম গরম শ্লোগান তুলে সিপিএম যখন সিপিআই থেকে আলাদা হলো, তখনই কমরেড শিবদাস ঘোষ অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, অবিভক্ত সিপিআইয়ের মত সিপিএমও যথার্থ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দল গঠনের সঠিক পদ্ধতি, বিপ্লবী আদর্শ ও সংস্কৃতি নিয়ে গঠিত না হয়ে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছে এবং এর অনিবার্য পরিণতিতে এই দলও ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে গা ভাসাবে। সেটা এখন নগ্নভাবে দেখা যাচ্ছে। তখন অনেকেই সেটা বুঝতে না পারলেও আজ বহু সৎ সিপিএম কর্মী-সমর্থক চোখের জল ফেলছেন। গদীসর্বস্ব নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের, পুঁজিপতিদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছেন, যখন তখন তাদের সাথে ওঠাবসা-শলাপরামর্শ করছেন; কৃষকদের সংগ্রাম-শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম- গণআন্দোলন দমনে পুলিশ ও ক্রিমিনাল বাহিনী লেলিয়ে দিতে, রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিতে, খুন করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করছেন না। মন্ত্রীত্বলোভী সিপিএম নেতৃত্ব এভাবে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছেন, তার সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া, দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি জমি তৈরী করছে। এই বিপদ রুখতে, বামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে এবং গণআন্দোলনগুলি সফল করতে সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকদের দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনে সামিল হওয়া আজ আবশ্যিক কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যেভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এই গণআন্দোলনে সামিল হয়েছেন, প্রতিবাদ করছেন, সেটা স্মরণীয় ও গোটা দেশের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই আন্দোলনে জনগণকে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ (যার মধ্যে তৃণমূলও আছে) প্রথম সেজের স্কীম রচনা করেছিল, উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে আদিবাসীদের হত্যা করে কৃষিজমি দখল করতে গিয়েছিল, ক্ষমতাসীন অন্যান্য রাজ্যেও কৃষিজমি দখল করছে; গুজরাট ও অন্যত্র দাঙ্গায় যে বিজেপি-র হাত রক্তাক্ত, সেই বিজেপি নেতারা নন্দীগ্রামে ছুটে এসেছেন সহানুভূতি জানাতে! কেন্দ্রে ও কিছু রাজ্যে ক্ষমতাসীন যে কংগ্রেসও একইভাবে কৃষিজমি দখল করছে তাদেরও নানা গ্রুপ পাল্লাপাল্লি করে ছুটে যাচ্ছে নন্দীগ্রামে সমবেদনা জানাতে! উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আগামীদিনের ভোট। বিজেপি যেমন সাম্প্রদায়িকতা করছে, সিপিএমও জমিয়তে উলেমা হিন্দের পাল্টা সংগঠনের জমায়েতে গিয়ে তাদের বিবেক কেনার জন্য লোভনীয় ঘোষণা করেছে। এটাও সুক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতাকেই কাজে লাগানো। মনে রাখতে হবে, হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি এই আন্দোলনে সর্বনাশ করবে। নন্দীগ্রামে-সিঙ্গুরে যে রক্ত ঝরেছে,

যাঁরা শহীদ হয়েছেন, যাঁরা লড়ছেন, তাঁদের কোন জাত-ধর্ম নেই। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী জনগণ।

জনগণকে মনে রাখতে হবে, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ টিকে থাকবে ততদিন কৃষিজমি দখল, শিল্প বন্ধ, শ্রমিক ছাঁটাই, বেকারীত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা ও অন্যান্য সঙ্কট বাড়তেই থাকবে, জনজীবনে বারবার আক্রমণও নেমে আসবে। তাই একদিকে চাই এই আক্রমণগুলিকে আশু ঠেকাবার জন্য আন্দোলন, অন্যদিকে চাই যত দ্রুত সম্ভব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা, যা একমাত্র বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদকে হাতিয়ার করেই সম্ভব। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এবং সিপিএমের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করলে আজকের দিনের গণআন্দোলনের, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের অপরিমেয় ক্ষতি হবে। আজ দেশে কেন্দ্রীয় ও সব রাজ্য সরকারগুলি এতটুকু জনমত, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ধার ধারে না, ফ্যাসিবাদী কায়দায় সর্বত্র প্রতিবাদ-আন্দোলনকে দমন করছে। এই অবস্থায় কোন আশু দাবি আদায় করতে হলেও চাই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, সংঘবদ্ধ, নৈতিকবলে বলীয়ান লাগাতার আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী লক্ষ্য নিয়েই চালনা করতে হবে।

জনগণকে মনে রাখতে হবে, অতীতের লড়াইগুলিতে বহু জীবনের কোরবানি সত্ত্বেও অন্ধভাবে নানা রাজনৈতিক দল ও নেতাদের পেছনে ছুটে অনেক ক্ষতি হয়েছে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ও ভীড় দেখে দেশের মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজীদের বিপ্লবী ধারার পরিবর্তে দক্ষিণপন্থী আপোষমুখী নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছিল, তার সুযোগ নিয়েই বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করেছে। এ রাজ্যেও একইভাবে সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসবিরোধী বিক্ষোভকে পুঁজি করে ক্ষমতায় এসেছে। তখন প্রচার করা হত, 'এখন কোন কথা নয়, কংগ্রেসকে হঠানো চাই', 'হঠাতে হলে সিপিএমকে চাই'। আজও আওয়াজ তোলা হচ্ছে, 'সিপিএমকে শিক্ষা দিতে হলে তৃণমূল-কংগ্রেস-বিজেপিকে চাই'। দক্ষিণপন্থী দলগুলি এই আন্দোলনে থেকে সংবাদমাধ্যমের ব্যাকিংয়ে সিপিএম-বিরোধী বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ভোটের জমি তৈরী করছে। 'ভোটে একের বিরুদ্ধে এক চাই', এই হাওয়ায় গা ভাসালে আবারও পস্তাতে হবে। জনগণ দেখছেন, এই আন্দোলনে ও অন্যান্য আন্দোলনে এস ইউ সি আইয়ের কর্মীরা বুকের রক্ত ঢেলে লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমে তার খবর প্রায় খুঁজেই

পাওয়া যায় না। সাংবাদিকরা দুঃখ করে বলেন, 'আমরা জানি, আপনারাই লড়ছেন, কিন্তু আমাদের সংবাদমাধ্যমে এস ইউ সি আইয়ের সংবাদ দেওয়ায় বাধা থাকে।' সংবাদমাধ্যমগুলি অতি ব্যস্ত সিপিএমের বিকল্প হিসাবে দক্ষিণপন্থীদের দাঁড় করাতে, ভয় এস ইউ সি আই সামনে এসে যাবে। কিন্তু এত করেও কি আমাদের দলের অগ্রগতি আটকাতে পারছে? কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই দল সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে জনগণের হৃদয়ে গভীর ভালবাসা ও আস্থায় স্থান করে নিচ্ছে।

জনগণকে মনে রাখতে হবে, জনজীবনের অন্যান্য দাবি সহ বর্তমান আন্দোলনের দাবিগুলি আদায় করতে হলে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এর জন্য চাই দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গঠন — যে কমিটিগুলি উপর থেকে অন্ধভাবে কোন দলের বা নেতানেত্রীর নির্দেশে চলবে না, ভোটের রাজনীতির দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হবে না। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে সকল মত বিচার করে গ্রহণ করবে। আর চাই সৎ, সাহসী, চরিত্রবান অসংখ্য যুবক-যুবতীদের নিয়ে সুশৃঙ্খল ভলান্টিয়ার বাহিনী — যারা ক্ষুদিরাম-সূর্য সেন-প্রীতিলতাদের মতই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাবে। এভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি, গণআন্দোলন ও বিপ্লবী সংগ্রামের অমোঘ হাতিয়ার।

আজ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-শহরে ঘরে ঘরে প্রবল শোকের আকুলতা, এত রক্তপাত, এত প্রাণহানি, এত নারী নির্যাতন, কী করে মানা যায়! এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করুন। সিপিএমের মেকি বামপন্থা ও সুযোগ- সন্ধানী দক্ষিণপন্থী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির দুষ্ট রাজনীতিকে পরাস্ত করে সংগ্রামী বামপন্থার নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন। নন্দীগ্রামের নিহত-আহতদের পরিজনদের ও অত্যাচারিত জনগণকে অর্থ ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করুন।

[এস ইউ সি আই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি প্রকাশিত হ্যান্ডবিল, ৩-৪-০৭]

জনস্বার্থবিরোধী বলেই
টাটার সঙ্গে চুক্তির শর্ত গোপন করছে সরকার

"শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে হাজার হাজার কৃষক ও খেতমজুরকে উচ্ছেদ করে রাজ্য সরকার টাটা ও সালিমদের হাতে কী কী শর্তে জমি তুলে দিচ্ছে সেটা ট্রেড সিক্রেটের নামে রাজ্যবাসীর কাছে গোপন করছে। এতেই পরিষ্কার যে, রাজ্য সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের এমন কিছু সুবিধে দিচ্ছে যার দ্বারা জনগণের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। আসলে একদিকে কোষাগারে ঘাটতির অজুহাত দেখিয়ে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ ব্যাপক ছাঁটাই করছে, অন্যদিকে একচেটিয়া পুঁজি ও মাল্টিন্যাশনালদের যথেচ্ছ মুনাফা লুণ্ঠনের সুযোগ দিতে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। ক্ষমতায় বসে এই সব অগণতান্ত্রিক জনস্বার্থবিরোধী কাজ করবেন, একথা প্রকাশ্যে বলেই কি তাঁরা গত নির্বাচনে ভোট চেয়েছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন, জনগণের রায় তাঁদের পক্ষে তাই যা ইচ্ছে তাঁরা করতে পারেন? বরং গত ৯ অক্টোবর সরকার ও শাসকদলের প্রবল বাধানিষেধ উপেক্ষা করে জনগণ সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করে সিঙ্গুর সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানের কৃষক ও খেতমজুরদের চাষের জমি থেকে উচ্ছেদের সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন।"

[এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিবৃতি, ১৯-১০-০৬]

হুলগির শেওড়াফুলিতে সাংবাদিক নিগ্রহের তীব্র নিন্দা

"সি পি এম সরকার গণতান্ত্রিক সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে পুলিশ দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আঘাত করতে উদ্যত। এই ঘটনা আবার প্রমাণ করছে, শুধু গণআন্দোলনকেই নয়, এই সরকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতাকেও নৃশংসভাবে দমন করছে। আমরা সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে লাঠিচালনার তীব্র নিন্দা করছি এবং তদন্ত করে দোষী পুলিশ অফিসারের শাস্তি দাবি করছি।

[এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিবৃতি, ৮-১২-০৬]

তাপসী হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি

"সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের ধর্ষণ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের যথাযথ তদন্ত ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে আমরা কলকাতায় মহাকরণের সামনে এবং জেলায় জেলায় পুলিশ সুপার ও এসডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। আমাদের

কয়েকশ' কর্মী আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের এই আন্দোলন চলছে।

২৩ ডিসেম্বর রাজ্যব্যাপী শোকদিবস পালিত হবে। রাজ্যের নানা এলাকায় স্মারকবেদী নির্মাণ, কালো ব্যাজধারণ, নীরবতা পালন ও সভা হবে।

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, তাপসী মালিকের হত্যার পরপরই সিপিএম নেতৃত্ব ন্যূনতম উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে ঘটনাস্থলে সাংবাদিক ও আমাদের কর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে মূল অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন, সি আই ডি এবং সি বি আই তদন্তের নামেও ঠিক সেটাই করা হচ্ছে। সি আই ডি রাজ্য সরকারের নির্দেশে চলে, সি বি আই চলে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। সিঙ্গুরের জনগণ এবং আমরাও মনে করি, এদের দ্বারা সত্য উদ্‌ঘাটন হবে না। ফলে আমরা দাবি করছি — সি আই ডি বা সি বি আই নয়, বিচারপতিদের দিয়েই এই তদন্ত করাতে হবে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে।

শিল্পস্থাপনের নামে কৃষিজমি দখল করা হচ্ছে শুধু সিঙ্গুরে নয়, অন্য জেলাতেও। ফলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গোটা রাজ্যের জনগণের। আমাদের দাবি — কোথাও কৃষিজমিতে কারখানা করা চলবে না, কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপন চলবে না। এই দাবিতেই সিঙ্গুরের আন্দোলন চলছে। সেখানে কিছু কৃষককে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কোন সমঝোতা হলে রাজ্যবাসী তা মেনে নেবে না, আমরাও মানব না।

[এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিবৃতি, ২২-১২-০৬]

টাটার মন্তব্য ঔদ্ধত্যমূলক, জনগণের প্রতি অপমানজনক

'সিঙ্গুর আন্দোলনকে টাটার বিরুদ্ধ শিল্পগোষ্ঠী মদত দিচ্ছে', রতন টাটার এই উক্তি সম্পর্কে এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, রতন টাটার উক্তি অত্যন্ত ঔদ্ধত্যমূলক। এস ইউ সি আই ও অন্যান্য যারা এই আন্দোলনে সামিল — এ শুধু তাদের প্রতিই নয়, রাজ্যের যে ব্যাপক জনগণ এই আন্দোলনে সামিল তাদের প্রতিও অপমানজনক। ব্রিটিশ বা কংগ্রেস আমলে কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস গণআন্দোলন সম্পর্কে এমন উক্তি করার স্পর্ধা দেখাতে পারেনি। সেটা সম্ভব হল সিপিএম রাজত্বে।

তিনি বলেন, এই একই কথা ক' দিন আগে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকও বলেছেন। শিল্পপতিদের কণ্ঠস্বর এবং সিপিএমের কণ্ঠস্বর আজ এক। রাজ্যের জনগণ কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও তীব্র করে এর উপযুক্ত জবাব দেবেন।

প্রভাস ঘোষ বলেন, তৃণমূল নেত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতিতে আমরা উদ্বেগবোধ করছি। আমরা এও মনে করি, রাজ্য সরকারের ফ্যাসিস্ট মনোভাবের

পরিবর্তন ঘটাতে হলে কোন একজন ব্যক্তির অনশনের দ্বারা তা ঘটতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন জনগণের সংগঠিত লাগাতার আন্দোলন। ব্যক্তির অনশন সেই গণআন্দোলনে ব্যাঘাতই সৃষ্টি করছে। সিঙ্গুরে দখল করা সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেওয়া এবং রাজ্যের কোথাও কৃষিজমি পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের দেওয়া চলবে না — একমাত্র এই দাবিপূরণের পথেই আন্দোলনের মীমাংসা হতে পারে। এছাড়া অন্য কোনও শর্তে মীমাংসার চেষ্টা হলে সিঙ্গুরের জনগণ এবং রাজ্যবাসী তা মেনে নেবে না।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা যখন বিধানসভায় এত সিট পেয়েছেন, তখন জনগণ তাঁদের পক্ষেই আছে। কিন্তু ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেননি যে, তাঁরা জোর করে কৃষিজমি দখল করে নেবেন। আমরা তাঁদের চ্যালেঞ্জ করছি, এই প্রশ্নে রাজ্যে একটা গণভোট হোক। কৃষিজমি দখল করে পুঁজিপতিদের দেওয়ার প্রশ্নে তাঁরা মতামত সংগ্রহ করুন। আমরা নিশ্চিত যে, শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ বিরুদ্ধে রায় দেবে। কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে আমরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছি।

কৃষিজমিতে শিল্পস্থাপন চলবে না

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য কমিটির চিঠি

মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,

আপনি জানেন, সিঙ্গুরে যেভাবে পুলিশরাজ কায়েম করে আপনি জোর করে কৃষিজমি দখল করেছেন, এ'রাজ্যের সাধারণ মানুষ তা মেনে নেয়নি। প্রতিদিন জেলায় জেলায় হাজার হাজার মানুষ আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েও সেকথা প্রমাণ করছেন। এজন্যই অবস্থান, অবরোধ, আইনঅমান্য, সাধারণ ধর্মঘট প্রভৃতি আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচিগুলি ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছে।

রাজ্যের সকল জেলায় আমাদের আন্দোলনে পুলিশ যেধরনের অত্যাচার চালাচ্ছে সেটা ব্রিটিশ শাসনেই দেখা যেত। বালুরঘাটে আমাদের দলের মহিলা কর্মীদের ডি এম অফিসের মধ্যেই পুলিশ বিবস্ত্র করে মেরেছে, রক্তাক্ত করেছে, যা দেখে আপনার দলের সংগঠন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য সিপিএম সমর্থকরা পর্যন্ত প্রতিবাদ না করে পারেননি। বোলপুরে স্বয়ং এস ডি ও আমাদের কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করেছেন। বাঁকুড়ায় এস ইউ সি আই জেলা অফিসে পুলিশ ঢুকে তছনছ করেছে এবং অফিসের ভেতর থেকে জেলা সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, মহিলা সহ ধৃত কর্মীদের বিরুদ্ধে 'পুলিশকে খুনের চেষ্টা'র মিথ্যা অভিযোগ এনে জামিন পর্যন্ত না

দিয়ে জেলবন্দী করে রাখা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের দিন উত্তর দিনাজপুর জেলার সরাই মোড়ে এক ব্যক্তির দুঃখজনক মৃত্যুর পর ঐ ঘটনাস্থল থেকে ৯ কিমি দূরবর্তী রায়গঞ্জ শহরের ডি এম অফিসের সামনে থেকে আমাদের দু'জন কর্মীকে (একজন প্রাথমিক শিক্ষক, অপরজন দশম শ্রেণীর ছাত্র) গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঐ মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে মিথ্যা মামলায় তাদের বন্দী করে রেখেছে। এখনও জামিন দেয়নি। এমন অনেক ঘটনাই জেলাগুলিতে আমাদের দলের ক্ষেত্রে পুলিশ করছে। এটা কি গণতান্ত্রিক শাসনের নমুনা?

অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর লাগাতার অনশন সম্পর্কে আপনি শুধু উদাসীন নয়, যে অনড় ভূমিকা নিয়েছেন তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই ঘটনা জনগণের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং তারা অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাইছেন।

সিঙ্গুর আন্দোলনের কর্মী ১৮ বছরের তাপসী মালিকের নির্মম হত্যার পর অতি দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার যে দায়িত্ব আপনার ছিল, তা পালন করার বদলে আপনি প্রকৃত দোষীদের আড়াল করারই চেষ্টা করছেন। আপনার সরকারের সি আই ডি এবং কেন্দ্রের সি বি আইয়ের ভূমিকা জনমনের সংশয়কেই দৃঢ় করছে।

এই অবস্থায় আমরা পুনরায় দাবি করছি —

১। রাজ্যের কোথাও কৃষিজমি একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনালদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, অনুর্বর ও অকৃষি জমিতেই শিল্পস্থাপন করতে হবে;

২। সিঙ্গুরে দখল করা সমস্ত কৃষিজমি কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে;

৩। সিঙ্গুর থেকে ১৪৪ ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে;

৪। তাপসী হত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে;

৫। এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বন্দী কর্মীদের মুক্তি দিতে হবে।

এই দাবিগুলি পূরণে আপনি সত্বর উদ্যোগী না হলে রাজ্যের জনগণ দাবিগুলি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

২৭ ডিসেম্বর, ২০০৬

ধন্যবাদান্তে

প্রভাস ঘোষ

[এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এই চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিবের হাতে তুলে দেন।]

নন্দীগ্রামে নোটিশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভুল স্বীকার সততা থেকে নয়

মুখ্যমন্ত্রী ২ জানুয়ারি এবং ৭ জানুয়ারি বলেছিলেন, সরকারের তরফ থেকে নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের কোন নোটিশ দেওয়া হয়নি। আর গতকাল ৯ জানুয়ারি প্রথম স্বীকার করলেন যে, হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়েছিল এবং এটা ভুল হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি ছিঁড়ে ফেলার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রীর বলা উচিত ছিল, তিনি ইতিপূর্বে দু'বার অসত্য কথা বলেছেন, সেটা তিনি স্বীকার করেননি। দ্বিতীয়ত জনগণকে বুঝিয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে এগোবেন — এই কথাটার মধ্যে রয়েছে একটা প্রতারণা।

সিপিএম সরকার প্রথমে ভেবেছিল, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তারা সাত বার পশ্চিমবাংলার মসনদে বসেছে, ফলে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তাদের হাতে প্রশাসন আছে, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী আছে, সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী আছে আর সংবাদমাধ্যমের একটা অংশেরও ব্যাকিং তাদের পক্ষে আছে — ফলে জনমতের কোন তোয়াক্কা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রথমে সিঙ্গুরে তারা বাধা পেল। শুধু সিঙ্গুরের কৃষক ও খেতমজুরদের কাছ থেকেই বাধা নয়, গোটা বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীতে নন্দীগ্রামে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তারা। পশ্চিমবাংলায় অল্প সময়ের ব্যবধানে জমি দখলের বিরুদ্ধে চারবার বন্‌ধ হল। এর ফলে সিপিএম সরকার বুঝতে পারছে, তারা যা করতে চাইছে, এত সহজে তা সম্ভব না। এখন তারা যে পথ নিতে চলেছে, সেটা হল জনগণের মধ্যে যে মিলিট্যান্ট মুড (লড়াকু মেজাজ) আন্দোলনের পক্ষে গড়ে উঠেছে তাকে স্তিমিত করে দেওয়া, ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, আন্দোলনে ফাটল ধরানো এবং নানাধরনের প্রলোভন দিয়ে মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা। এইভাবে তাঁরা গোটা আন্দোলনটাকে স্তিমিত করে দিয়ে কৃষিজমি দখলের তাদের স্কিমকে দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে কার্যকর করতে চায়। আমরা জানি, বিরোধী দলগুলির মধ্যে যে সব দক্ষিণপন্থীরা অন্যান্য রাজ্যে একইভাবে এসইজেড গঠন করার জন্য একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে কৃষিজমি দখল করছে, তারাই এ রাজ্যে জনগণের বিক্ষোভ দেখে ভোটের স্বার্থে বিরোধিতার মহড়া দিচ্ছে। তারা যদি চেষ্টাও করে, এই আন্দোলনকে বিপথগামী করতে পারবে না। আমরা সমস্ত জায়গায় গণকমিটি গড়ে তুলছি, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলছি। আমাদের দাবি, সিঙ্গুরে যত জমি দখল করা হয়েছে তা চাষীদের ফেরত দিতে

হবে। রাজ্যের কোথাও কৃষিজমি দখল করা চলবে না। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ যেসব জায়গায় অকৃষি জমি রয়েছে, একমাত্র সেসব জায়গায়, যে শিল্প তারা করতে চাইছে, করতে পারে।...

মেধা পাটকরের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, যেভাবে মেধা পাটকরকে গৃহবন্দি করা হল তাতে একথা প্রমাণিত, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই। কলকাতা শহরে তো ১৪৪ ধারা নেই। অথচ তাঁকে শহরের একটা বাড়িতে গৃহবন্দি করা হল। এইভাবে সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের চর্চা করছে! এখানে কোন গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতান্ত্রিক আন্দোলন — কোন কিছুরই অধিকার নেই। সমস্ত দিক থেকে ফ্যাসিবাদি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

নন্দীগ্রামে বিনয় কোঙার যে উস্কানি দিয়েছেন এবং যেভাবে সিপিএম খেজুরি থেকে, হলদিয়া থেকে আক্রমণ চালাল, সে প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আজকের সংবাদপত্রের রিপোর্টে আছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হোম সেক্রেটারিকে জানিয়েছেন যে, খেজুরি থেকে আক্রমণ করা হয়েছিল। খেজুরি হচ্ছে একটা এলাকা, যেটা সমস্ত দিক থেকে সিপিএমের সন্ত্রাস কবলিত। খেজুরিতে কোন বিরোধী দল মিছিল-মিটিং করতে পারে না। এখান থেকে কারা আক্রমণ করেছিল? সর্বদলীয় মিটিংএ সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেসব জায়গায় পার্টি ক্যাম্প হয়েছে সেগুলি নন্দীগ্রাম বর্ডার থেকে ৫ কিলোমিটার সরিয়ে নিতে হবে। এই পার্টি ক্যাম্প কারা করেছিল? এস ইউ সি আই করেনি, অন্য কোন দল করেনি, করেছিল সিপিএম। সিপিএম সমস্ত দিক থেকে এখানে ক্রিমিন্যাল নিয়োগ করেছিল এবং রাজ্য সরকারকে এটা স্বীকার করতে হবে যে, তারা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছে। নন্দীগ্রামে যারা কৃষকদের হত্যা করেছে তাদের বিচার চাই। এবং সিঙ্গুরের মাটিতে যে দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে রাজকুমার ভুল এবং তাপসী মালিক — এদের খুনিদের বিচার চাই। এজন্য পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন চলবে। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জেলায় কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবক-মহিলা-বুদ্ধিজীবী সকলেই ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়ভাবে কৃষকদের এই সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সিপিএমের নিচুতলার অধিকাংশ কর্মী-সমর্থক নেতৃত্বের বিরোধিতা করে এই আন্দোলনে সমর্থন জানাচ্ছে। সিপিএম নেতৃত্ব আজ কোণঠাসা এবং কোণঠাসা হয়ে নেতারা নানা স্ববিরোধী কথা বলছেন। আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই — যেখানেই তারা কৃষিজমি দখল করতে যাবে, সেখানেই তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। জনগণ সেভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে। সমস্ত জায়গায় জনগণ গণকমিটি গঠন করে, ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। কোন দলকে অন্ধের মতো মানা নয়, কোন নেতাকে অন্ধের মতো মানা নয়। সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুল হয়েছে। সিঙ্গুরের আন্দোলনকে

কলকাতায় এনে অনশনের দ্বারা — আন্দোলনের যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সিঙ্গুরের বুকে এবং পশ্চিমবাংলায়, সেটাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। এই ধরনের কোন ভুলের পুনরাবৃত্তি জনগণ করতে দেবে না, এটা আমরা বলতে চাই। কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে আমরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রচার চালাচ্ছি।

[১০ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য]

এস ই জেড বহাল রাখার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করল এস ইউ সি আই

একচেটে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী চূড়ান্ত জনবিরোধী এস ই জেড প্রকল্প বহাল রাখার যে ভয়াবহ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালনাধীন ইউ পি এ সরকার গ্রহণ করেছে, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৭ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

তিনি বলেন, এস ই জেড প্রকল্প হল, স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের নির্মম শ্রমিকশোষণের ঘৃণ্য নকশা, যার বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে এবং নন্দীগ্রামের বীর কৃষকসমাজ সাহসের সঙ্গে এর প্রতিরোধ করতে গিয়ে পৈশাচিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং পরিকল্পিত গণহত্যার শিকার হয়েছে। নন্দীগ্রাম গণহত্যার জেরে গোটা দেশজুড়ে নিন্দা, ঘৃণা ও প্রতিবাদের ঝড়ে সরকার কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল ; দাবি উঠেছিল, এস ই জেড প্রকল্প সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। এই অবস্থার সামনে পড়ে ইউ পি এ সরকার পুনর্বিবেচনার নাম করে প্রস্তাবিত সমস্ত প্রকল্প স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেও অতি দ্রুত 'সংশোধিত' এস ই জেড নীতি পুনরায় ফিরিয়ে এনেছে। এস ই জেড সম্পূর্ণ বাতিল করার মূল দাবিকে ধামাচাপা দিতে এদিক-ওদিক কিছু রদবদল করে বলা হচ্ছে, এই নীতি এখন নাকি 'মানবিক মুখ' সম্পন্ন হল। কমরেড মুখার্জী বলেন, যে ধূর্ততা এবং দ্রুততার সঙ্গে এই সর্বনাশা নীতিকে বহাল রাখা হল তা প্রমাণ করে এই সরকারের বিন্দুমাত্র মানবিকতা এবং জনগণের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা নেই।

সারা দুনিয়া জুড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে ঘোর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এই ভারতীয় মডেল তৈরি ও রূপদানের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার অপরাধে সিপিআই(এম) ও তার মিত্র দলগুলিকে অভিযুক্ত করে কমরেড মুখার্জী বলেন, এই ছদ্ম মার্কসবাদীরা যাদের হাতে নন্দীগ্রামের দরিদ্র কৃষকের

রক্তের দাগ, তারা এখন এস ই জেড নীতির লোকদেখানো বিরোধিতায় নেমেছে নিজেদের কলঙ্কিত ভাবমূর্তি উদ্ধার করার চেষ্টায়। তারা বলছে, নতুন এস ই জেড নীতি তৈরি করার সময় ইউ পি এ সরকার নাকি সিপিএমের দেওয়া বেশ কিছু পরামর্শ গ্রহণ করেনি, যার ফলে এই নীতি 'সর্বাঙ্গীণ' এবং 'প্রয়োজনের উপযুক্ত' হতে পারেনি। জনগণের মূল দাবিকে আড়াল করে এই ছদ্ম মার্কসবাদীরা নানা কথা বলে আসলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের হীন কার্যকলাপের উপর প্রলেপ দেওয়ার কাজ করছে এবং এস ই জেড-এর মাধ্যমে বর্বর শোষণের রাস্তাই সুগম করে দিচ্ছে।

সিপিআই(এম)-এর সৎ কর্মী-সমর্থক সহ দেশের বিবেকবান ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের কাছে কমরেড মুখার্জী, ছদ্ম মার্কসবাদীদের প্রতারণা ও দ্বিচারিতাকে উদ্‌ঘাটিত করে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারকে এস ই জেড নীতি বাতিলে বাধ্য করতে আপসহীন সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একমাত্র এই পথেই নন্দীগ্রাম গণহত্যার মতো পাশবিক হিংস্রতাকে রোখা সম্ভব।